ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়া
রিয়াদ, সৌদিআরব
২০০৯—১৪৩০

ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান
(প্রথম খণ্ড)

[বাংলা - Bengali]

মো. ওসমান গনি

সম্পাদনা : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম। সর্ব যুগের শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বাধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম ইসলাম। ইসলাম শান্তি চায়, ইসলাম অগ্রগতি চায়, ইসলাম চায় মানব জাতির জন্য সমুজ্জল ভবিষ্যৎ। ইসলামের আইন কানুন, আদেশ, নির্দেশ, অনুসরণ, অনুকরণ মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয়, সর্বদিক থেকে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বয়ে আনে যা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্ক বিচার বিশ্লেষণসহ একটি পরীক্ষিত সত্য হিসাবে সুপ্রমাণিত হয়েছে।
বর্তমান দুনিয়ায় পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় এমন কি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে অশান্তি বিরাজমান রয়েছে তার মূল কারণ হলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মেনে না চলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান আদর্শ অনুসরণ না করা।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কুরআন জ্ঞান ভান্ডার হিসাবে অবতীর্ণ করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই জ্ঞান মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই কুরআনে এমন কিছু জ্ঞান রয়েছে যা কিছুদিন পর প্রকাশ পাবে।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨سورة ص﴾

অর্থঃ এটা (কুরআন) তো বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ মাত্র। তোমরা কিছুকাল পর এর সংবাদ অবশ্যই জানতে পারবে। (সূরা ছোয়াদ, ৩৮ঃ৮৭ আয়াত)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا(سورة النمل ٩٣)

অর্থঃ আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; সত্বরই তিনি তাঁর নিদর্শন সমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। (সূরা নামল, ২৭ঃ ৯৩ আয়াত)।

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ (سورة يونس ٣٩)

অর্থঃ বরং যা তাঁরা বুঝতে অক্ষম তা তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আরম্ভ করেছে। অথচ এখনও তাদের কাছে এর বিশ্লেষণ আসেনি। (সূরা ইউনুস, ১০ঃ ৩৯ আয়াত)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿سورة الحاقة٣٩﴾

অর্থঃ তোমরা যা দেখ এবং যা দেখ না আমি তার শপথ করে বলছি। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ঃ ৩৮ও ৩৯ আয়াত)।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ আয়াতে শপথ দিয়ে শুরু করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। এই সব জিনিসের বিশেষ গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তার কসম করা হচ্ছে। এখানে এমন এক জগতের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে, যা খালি চোখে দেখা যায় না। এই সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি রয়েছে। এগুলো এত ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম জীবানু যা খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু এগুলোর সাথে মানুষের স্বাস্থের বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। প্লেগ রোগ লক্ষ লক্ষ মানুষ ধ্বংস করে দেয়। এমন ধরনের ধ্বংসাত্মক অনেক রোগ রয়েছে যার কারণ হচ্ছে এই ব্যাকটেরিয়া অথবা ভাইরাস।
এই সমস্ত ক্ষুদ্র জীবানু আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। এদের পরিচয় আগে কেউ জানত না। আমরা জানি না কখন আমাদের শরীরে ওরা প্রবেশ করে এবং কখন আমাদের শরীর থেকে বের হয়। মানুষ এগুলোর পরিচয় লাভ করেছে আঠারো শতাব্দীতে।
এখন প্রশ্ন হলো, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জগত এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কি কোন অভিজ্ঞ ছিলেন? যে জগতের সাথে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের নিবিড় সম্পর্ক, হাদীস ও কুরআনের যে আয়াতগুলির সাথে এই জগতের যোগাযোগ রয়েছে, আমরা যদি ঐগুলি একত্রিত করি তাহলে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে ঃ যেহেতু সেই হাদীস ও আয়াতে নির্দেশাবলী

পালনের মাধ্যমে এই সমস্ত জীবানু সংক্রান্ত রোগ থেকে মানুষ সম্পুর্ণ মুক্ত থাকতে পারে সেহেতু নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এ কথা বা দ্বীন বর্ণনা করেননি, বরং তিনি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল।

আমাদের এ কথা ভাল ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগমণ ঘটেছিল মানুষদেরকে আল্লাহর দাসে পরিণত করার জন্য, জড় জগতের রহস্য উদঘাটনের জন্য নয়। প্রাকৃতিক জগতের ভাঙ্গা গড়া কি ভাবে হয় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব ছিল না, বরং কেন হয়, এ অবস্থায় মানুষের কি কর্তব্য তা বর্ণনা করাই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাত সম্পর্কীয় বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের উৎস অহী। এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছেঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (سورة الحشر٧)

অর্থঃ রাসূল যা কিছু তোমাদেরকে নির্দেশ করেন তা মেনে নাও। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৭ আয়াত)। কেননা-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿النجم٤﴾

অর্থঃ তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না, কুরআন হচ্ছে অহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (সূরা নজম, ৫৩ঃ ৩ ও ৪ আয়াত)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা জীবন পরিচালিত হয়েছে মুলতঃ নির্ভুল জ্ঞান অহীর মাধ্যমে। তাই এই নির্ভুল জ্ঞানে বেড়ে উঠা প্রজ্ঞা ও মেধার মাধ্যমে বৈষয়িক জীবন সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যাপারে হাদীস নির্ভুল বুদ্ধি ও যুক্তির দাবী রাখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ হাদীসে যে সব বৈষয়িক বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা সেই সময়ের মানুষের জন্য যতটা না বোধগম্য ছিল, আজ বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কারের ফলে কুরআন ও হাদীসের যথার্থতা ও সত্যতা শুধু স্বীকারই নয় বরং আজ তা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আজকের বিজ্ঞানীগণ পবিত্র বুরআন ও হাদীসের সত্যতা ও গভীরতায় শুধু অবাকই হচ্ছেন না, বরং নব আবিস্কারের উৎস হিসাবে গ্রহণ করছেন।

মানুষ নতুন উদ্যমে ভাবতে শুরু করেছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস। চলছে সাধনা ও গবেষণার জগতে এক বিস্ময়কর জাগরণ। তবে আজ বড় প্রয়োজন কুরআনকে গভীরভাবে উপলদ্ধি করা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণীকে বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ উজ্জল আলোকে বিশেষণ করা।

তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, ইসলামী বিধান কোন বৈজ্ঞানিক লাভ ক্ষতির উপর আদৌ নির্ভশীল নয়। আল্লাহর বিধান কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহর বিধাণ চিরন্তন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় সৃষ্টি জগতের মধ্যে নির্দেশ, হুকুম ও ইবাদতের মাধ্যমে যা কিছু অত্যাবশ্যক করেছেন তাতে রয়েছে হিকমত, গোপন তত্ব ও সার্বিক কল্যাণ যা স্বীয় বান্দাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সফলতা বয়ে নিয়ে আসে। আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, ইবাদত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করাই হলো মূল বা আসল, যদিও সেই ইবাদতগুলির হিকমত ও মূল রহস্য উদঘাটন না হোক। অতএব মুসলিমদের উচিৎ হবে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে তাঁর আদেশগুলি পালন করা, আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। যদি ইবাদত সমূহের হিকমত ও মূল রহস্য বান্দার কাছে প্রকাশিত হয় তাহলে তার ইয়াকীন বৃদ্ধি পাবে এবং ঈমান মযবুত হবে এ জন্য যে, আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশে রয়েছে বান্দার সার্বিক সফলতা, সৌভাগ্য, কামিয়াবী ও মঙ্গল।

এ পুস্তকে কিছু ইসলামী বিধান যা উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা মুকাররামা, সৌদী আরবে অধ্যায়নরত অবস্থায় আমার হৃদয়ে আকর্ষন সৃষ্টি করেছিল সেগুলি বিভিন্ন কিতাব, পত্র পত্রিকার তত্ত্ব ও বন্ধু বান্ধবের সহযোগিতা নিয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশেষণ করে “ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান” নামে এর প্রথম খন্ড পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিচ্ছি।

অন্যান্য আহকাম গবেষণাধীন রয়েছে। মানুষ হিসাবে ভুল ত্রুটি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সম্মানিত পাঠকগণের নিকট আমার আকুল আবেদন, কোথাও কোন ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অথবা সংযোজন বিয়োজনের প্রয়োজন মনে করলে দয়া করে আমাকে জানাবেন। আপনাদের সুপরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে ঐ সব সহযোগী ও শুভাকাংখীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাকে সর্ব কাজে সাহায্য করেছেন। তারা অনেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করেছেন বিধায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

মুহাম্মাদ ওসমান গনি

ذِلكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ (سورة البقرة : ٢)

ইহা এমন গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা বাকারা ঃ ২ আয়াত)।

আল কুরআন চিরন্তন মু'জিযা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সৃষ্টি করে রুহের জগতে সমস্ত রুহ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের প্রভু নই?) তারা প্রতিউত্তর করেছিলঃ بَلى (অবশ্যই)।

তার পর ক্রমান্বয়ে মানব জাতির পৃথিবীতে আগমন ঘটে। মানুষ যখন শয়তানের কুমন্ত্রনায় সেই অঙ্গিকারের কথা ভুলে গিয়ে পথভ্রষ্ট হতে থাকে তখন সৃষ্টিকর্তা স্বীয় দয়া ও করুণায় তাদের হিদায়েতের জন্য নবী রাসূল প্রেরণ করেন। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় অথবা দলের কাছে কোন দূত প্রেরণ করেন তখন এমন কিছু আলামত তার সাথে পাঠান যাতে তারা আশ্বস্ত হতে পারে যে, সে সত্যিই তার পক্ষ থেকে এসেছে। কোন ব্যক্তি যদি তার সংবাদ বাহকের সত্যতা ও তার পরিচয়ের জন্য আলামত নির্ধারণ করতে পারে, আর যিনি আহকামুল হাকেমীন তিনি কি তার স্বীয় রাসূলগণের পরিচয়ের জন্য আলামত নির্ধারণ করবেন না?

এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলগণের হাত দিয়ে এমন কিছু আলামত প্রকাশ পায় যা একমাত্র সৃষ্টিকর্তার বৈশিষ্ট। সৃষ্টি জগতের কেহ অনুরূপ করতে অপারগ। অতঃপর তারা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানতে পারে যে, এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না। এটাই হচ্ছে মু'জিযা, আর মু'জিযা প্রকাশ পায় আল্লাহর হক নবীগণের মাধ্যমে তাদের সত্যতা এবং তাদের রিসালাত সাব্যস্ত করার জন্য। ঈসা (আঃ) এর জবানে এরশাদ হচ্ছেঃ

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿آل عمران٤٩﴾

অর্থঃ আর বনী ইসরাইলদের জন্য রাসূল হিসাবে তাকে মনোনীত করলেন। তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই, তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা আল্লাহর হুকুমে উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায়। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে। আমি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করে দেই এবং আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে তোমাদের জন্য নির্দশন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (সূরা আলে ইমরান, ৩ঃ ৮৯ আয়াত)।

প্রত্যেক যুগের নবী রাসূলকে তিনি সে যুগের জনগণের সাধারণ প্রবনতা অনুপাতে মু'জিযা দান করেছেন। ঈসা (আঃ) এর যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। তাকে মু'জিযা দেয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টি সম্পন্ন করে দেয়া এবং কুষ্ট রোগগ্রস্থকে সুস্থ করে তোলা।

وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (الإسراء ١٠١)

অর্থ ঃ আমি মূসাকে প্রকাশ্য নয়টি মু'জিযা দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ঃ ১০১ আয়াত)।

তার মধ্যে লাঠিকে সাপে পরিণত করা এবং হাতকে বগলের ভিতর থেকে বের করে শুভ্র করা ছিল প্রধান; যেহেতু সেই যুগে জাদু মন্ত্রের বহুল প্রচলন ও প্রচুর প্রভাব ছিল।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক যুগে আরবে প্রেরিত হয়েছিলেন যে যুগে আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ ও চিরন্তন মু'জিযা হিসাবে আল-কুরআনকে নির্ধারণ করেছেন যার রয়েছে বর্ণনা নৈপূণ্য, পরিধি নিরূপণ, অতি অল্পে বিশাল বর্ণনা, অপরূপ প্রকাশ ভঙ্গী, অতি উচ্চাঙ্গের উপমা, ভাবের গাম্ভীর্য, তথ্যের বিশুদ্ধতা, চিত্তাকর্ষক সুবিশাল সাবলিল গাথুনী। নেই তাতে অসংগতি বা অসামঞ্জস্য।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿فصلت٤٢﴾

অর্থঃ এতে মিথ্যার কোন প্রভাব নেই; সামনের দিক থেকেও নেই এবং পিছনের দিক থেকেও নেই। এটা প্রাজ্ঞ, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ঃ ৪২ আয়াত)।

তাই এই কুরআন শুধু আরব জাতির জন্য নয়, বরং সারা দুনিয়ার সর্ব যুগের মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। সেই যুগের ও বড় বড় কবি সাহিত্যিক কুরআনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। মক্কার কাফিরদের সামনে কুরআন সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿الإسراء٨٨﴾

অর্থঃ বলুন! যদি মানব ও জিন জাতি এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনায়নের জন্য একত্রিত হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয় তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। (সূরা ইসরা, ১৭ঃ ৮৮ আয়াত)।

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿البقرة٢٤﴾

অর্থঃ এতদ সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। এক আল্লাহকে ছাড়া, তোমাদের সেই সব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার, অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সেই জাহান্নামের আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। (সূরা বাকারা ২ঃ ২৩ও২৪ আয়াত)। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছেঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿هود١٤﴾

অর্থঃ তারা কি বলে, কুরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অতঃপর তারা যদি তাদের কথা পূরণ করতে অপারগ হয় তাহলে জেনে রেখ, এটি আল্লাহর ইল্‌ম দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে, আর ইয়াকীন করে নাও যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। অতএব এখন কি তোমরা আত্মসমার্পন করবে? (সূরা হুদ, ১১ঃ ১৩ ও ১৪ আয়াত)।

কুরআনী চ্যালেঞ্জের সামনে সকলে স্তব্দ হয়ে গেল। আরবের কাফির মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দাবী মিথ্যা প্রমাণিত করার এমন কোন প্রচেষ্টা নেই যা অবলম্বন করেনি। এই পথে তারা তাদের জান মাল সব বিলিয়ে দিয়েছে। প্রিয় এবং নিকটজনদেরকে নিঃসংকোচে ত্যাগ করেছে। নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। তাদের যুদ্ধবাজরা ময়দানে তাবু গেড়েছে। প্রাণ বাজি রেখে লড়াই করেছে। সম্পদশালীরা তাদের সমস্ত ধন ভান্ডার উজাড় করে দিয়েছে। কবি, সাহিত্যিক এবং অনল বর্ষী বক্তারা আরবের মরুভূমিকে উত্তপ্ত অনলে পরিণত করেছে। এ সব কিছুই তারা করেছে। কিন্তু যা পারেনি তা হল পবিত্র কুরআনের ছোট্ট একটি সূরার অনুরূপ কিছু রচনা করে উক্ত চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে। তারা এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এটা কোন মানুষের তৈরী হতে পারে না।

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿يونس٣٧﴾

আর এই কুরআন এমন কোন জিনিস নয় যা আল্লাহর অহী ও শিক্ষা ব্যতীত রচনা করে লওয়া সম্ভব হতে পারে; বরং এতো পূর্বে যা এসেছে এর সত্যতার স্বীকৃতি ও আল-কিতাবের বিস্তারিত রূপ। এটা যে বিশ্বনিয়ন্তার তরফ হতে আসা কিতাব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা ইউনুস, ১০ঃ ৩৭ আয়াত)।

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿غافر٢﴾

অর্থঃ এই (কুরআন) মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ হতেই অবতীর্ণ গ্রন্থ। (সূরা মূ'মিন, ৪০ঃ আয়াত)।

এই কালজয়ী গ্রন্থে যেমন রয়েছে জ্ঞানের প্রসার, যুক্তির দৃঢ়তা ও তথ্যের নির্ভুলতা, তেমনি রয়েছে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানব জীবনের প্রত্যেক দিকের পরিপূর্ণ আলোচনা। বিশ্ব পরিচালনায় সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভূল বিধান। এ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, এমনকি রাজনীতি ও সমাজ নীতির সকল দিকের নির্ভুল পথ নির্দেশ। এক কথায় বলতে পারি যে, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সকল দিক যা মানুষের কল্পনায় উদ্ভব হতে পারে, সব কিছুই এ গ্রন্থে রয়েছে।

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الأنعام ٣٨)

অর্থঃ আমি কোন কিছু লিখতে বাদ দিইনি। (সূরা আনআম, ৬ঃ ৩৮ আয়াত)।

আল্লাহর এই বিধানগুলি যখনই গভীর ভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করা হয় তখনই সুস্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুটিত হয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এগুলি একমাত্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্যই নির্ধারণ করেছেন, আর সেই মুহূর্তেই আমার মাথা মহান আল্লাহর জন্যই মনের অজান্তে এমনিতেই নুয়ে আসে।

বিজ্ঞান শিক্ষা করার প্রতি কুরআনের উৎসাহ

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। আল্লাহই সর্বময় ও সকল ক্ষমতার উৎস। মানবকুলের নিয়ন্ত্রণ ও সার্বক্ষণিক শান্তির জন্য তিনি তাদেরকে দিয়েছেন বিশ্ব স্বীকৃত কালজয়ী মহান আদর্শ কুরআন, যার মধ্যে রয়েছে সর্বকালেন মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও সার্বজনীন দিক নির্দেশনার পাশাপাশি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় সমূহের অসংখ্য আলোচনা। বস্তু জগতের জ্ঞানই 'বিজ্ঞান'। আল কুরআন ধর্মীয় বিষয়াবলির সাথে সাথে পার্থিব জ্ঞান লাভের জন্য পৃথিবীর বস্তু জগত তথা বিজ্ঞান বিষয়ক বহু আলোচনা করেছে। এভাবেই কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক। আজ বিজ্ঞানের অভুতপূর্ব উন্নতিতে চমকে উঠা মানুষ কুরআনী জীবন ব্যবস্থাকে বর্তমান যুগের জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে করছে। তাই কুরআনের ব্যাপ্যারে বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত ইসলাম মানুষের কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তা জিবরাঈল আ. এর মাধ্যমে কুরআন আকারে নাযিল হতে শুরু করল তখন তার প্রথম বাক্য ছিল 'পড়'।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿العلق٥﴾

অর্থঃ পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাধা রক্ত থেকে। পাঠ করুন, মহা দয়ালু আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষ যা জানত না। (সূরা আলাক, ৯৬ঃ ১-৫ আয়াত)।

ইসলাম আমাদেরকে যেমন ইলম বা জ্ঞান অর্জন করার জন্য আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছে তেমনি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যাতে আমরা জগত সমূহকে নিয়ে চিন্তা গবেষণা করি। এমন কি আমাদের হৃদয়ে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে ভাবনার উদ্ভব হয় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা যেন গবেষণা করি। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ (الأعراف١٨٥)

অর্থঃ আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা কি তারা দেখেনি? (সূরা আরাফ, ৭ঃ ১৮৫ আয়াত)।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ (النحل ٤٨)

অর্থঃ তারা কি আল্লাহ সৃজিত বস্তুসমূহ দেখে না? (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৪৮ আয়াত)।

انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (يونس ١٠١)

অর্থঃ আসমান সমূহ ও যমীনে কি রয়েছে তোমরা চেয়ে দেখ। (সূরা ইউনুস, ১০ঃ ১০১ আয়াত)।

فَانْظُرْ إِلَى آَثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الروم ٥٠)

অর্থঃ অতএব তোমরা আল্লাহর রহমতের নিদর্শন লক্ষ কর, কিভাবে তিনি পৃথিবীর মাটিকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন। (সূরা রুম, ৩০ঃ ৫০ আয়াত)।

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾

অর্থঃ মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক। সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ২৪ আয়াত)।

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾

অর্থঃ মানুষদের খেয়াল করা উচিত, কি বস্তু থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা তারিক, ৮৬ঃ ৫ আয়াত)।

উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলিতে জ্ঞানী লোকদেরকে মহান আল্লাহ বিজ্ঞান চর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং আহবান জানিয়েছেন। অপর দিকে যারা চিন্তা ও গবেষণা করে তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ(آل عمران ١٩١)

অর্থঃ যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ঃ ১৯১ আয়াত)। এই আয়াতে জ্ঞানী লোকদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। তারা সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করেন। আল্লাহর কুদরতের বৈশিষ্টে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহকে সর্বাবস্থায় স্মরণ করেন।

এ ছাড়াও আল্লাহ মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানী, বিদ্বান ও চিন্তাশীল তাদের নিকট বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনা ও যুক্তি পেশ করে পরিশেষে বলেছেনঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ -١٣-٤

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣-٣

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ٣٠-٢٢

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ٢٤-٤٤

এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন। আবার কখনও বলেছেন চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এবং দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان٢٠)

অর্থঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনুগ্রহ সম্পুর্ণ করেছেন। (সূরা লুকমান, ৩১ঃ ২০ আয়াত)।

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿الفتح٢٣﴾

অর্থঃ পূর্ব হতে আল্লাহর এরূপ বিধান চলে আসছে। তুমি আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না। (সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ঃ ২৩ আয়াত)।

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿الانعام١١٤﴾

অর্থঃ তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি তারা নিশ্চিত জানে যে,

এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (সূরা আনআম, ৬ঃ ১১৪ আয়াত)।

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿الانعام١١٥﴾

অর্থঃ আপনার রবের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুসম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সূরা আনআম, ৬ঃ ১১৫ আয়াত)।

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿المائدة ٥٠﴾

আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম হুকুমদাতা কে রয়েছে? (সূরা মায়িদা, ৫ঃ ৫০ আয়াত)।
কেন ইসলাম প্রতিটি বস্তু নিয়ে গবেষণার আদেশ করেছে? তা এ জন্য যে, ইসলাম হচ্ছে সঠিক ও সত্য ধর্ম যা প্রকৃত স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত। আল্লাহর সমস্ত মাখলুকাতের জ্ঞান তাঁর প্রতি এবং তাঁর ধর্মের প্রতি ঈমানকে শক্তিশালী করার একটি পন্থা।
সঠিক ধর্ম অবশ্যই সঠিক জ্ঞানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। অনুরূপ ভাবে সঠিক জ্ঞান সঠিক ধর্মের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

পবিত্রতায় লাভ কি?

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা হলো ইসলামের এমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আমল যা অন্য কোন ধর্মে পরিলক্ষিত হয় না। ইসলামে পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ(مسلم) الطهور شَطْرُ الايْمَان পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। (মুসলিম)। অপর এক হাদীসে বর্ণিতঃ (مسلم) لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُوْرٍ পবিত্রতা ছাড়া নামায গৃহিত হবে না। (মুসলিম)
আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ(المائدة ٦)

অর্থঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দন্ডায়মান হও তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাছেহ কর এবং তোমাদের পা'গুলি গিরা পর্যন্ত ধৌত কর। (সূরা মায়েদা, ৫ঃ ৬ আয়াত)।
এই পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এক দিকে যেমন এর মাধ্যমে ইবাদত করা হচ্ছে, সাওয়াব অর্জন হচ্ছে এবং গুনাহ মাফ হচ্ছে অপর দিকে রয়েছে সুস্থতাসহ সার্বিক কল্যাণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلى مَا يَمْحُو اللّهَ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلى يَا رَسُولَ اللّه، قَالَ إِسْبَاغُ الوَضوُءِ علـى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إلى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذلكُمْ الرِّبَاطُ فَذلكُمْ الرِّبَاطُ (مسلم)

অর্থঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক জিনিসের সন্ধান দিব না যার দ্বারা আল্লাহ গুনাহ মুছে দিবেন এবং সম্মান বৃদ্ধি করে দিবেন? তারা বললেনঃ হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেনঃ সুন্দর ও ভালভাবে অযূ করা, বেশী বেশী মসজিদে গমন করা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা। এগুলি অবশ্যই তোমরা নিয়মিতভাবে পালন করবে। (মুসলিম) অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

اذا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خطيئةٍ نظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّى يَخْرُجَ نَقيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ (رواه مالك)

অর্থঃ যখন কোন মুসলিম অথবা মু'মিন বান্দা অযূ করে, অতঃপর তার মুখ মণ্ডল ধৌত করে, পানির সাথে তার চক্ষু দিয়ে যে গুনাহ সংঘঠিত হয়েছে সেই সকল গুনাহ চেহারা থেকে বের হয়; এমন কি সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

বিজ্ঞান প্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাচ্ছে ইসলামী বিধি বিধান ততই নির্ভুল, সত্য ও সার্বিক কল্যাণকর হিসাবে পরিগনিত হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রকাশ যে, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও অন্যান্য এমন সব ক্ষুদ্র জীবনু আকাশে বাতাসে বিচরণ করছে যা সব সময় মানুষের মুখ, চোখ, নাক, কান, এমনকি লোমকুপসহ বিভিন্ন পথ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে।

ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ বর্ণনা করেছেনঃ অযূর দ্বারা শরীরের ঐ অংশ পরিস্কার হয় যে অংশ শরীরে রোগ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের প্রধান মাধ্যম।[1] রোগ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে রাখার সহজ পদ্ধতি এটাই যে, ঐ অঙ্গগুলির সংরক্ষণ করতে হবে। অযূ দেহে রোগ ব্যাধি প্রবেশের রাস্তা সমূহের অতন্ত্র প্রহরী। অযূর পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে উসমান বিন আফ্‌ফান রা. এর হাদীসঃ

إنه دعا بوضوءٍ فَتَوَضَّأَ: فَغَسَلَ كَفَّيْه ثَلاثَ مرّات، ثمّ مَضْمَضَ واستَنْثَرَ ثمّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّات، ثمّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنى إلى الْمَرَافِق ثَلاثَ مَرَّات، ثمّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرى مِثْلَ ذلك، ثُمَّ مَسَحَ رأسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنى إلى الْكَعْبَيْن ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرى مِثْلَ ذلك، ثمّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تَوَضأَ نحْوَ وَضُوْئِى هــذا (رواه مسلم)

অর্থ: তিনি অযূর পানি আনতে বললেন। অতঃপর অযূ করলেন। তিনি দুই হাতের কবজি তিনবার করে ধৌত করলেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। এমনি ভাবে বাম হাত ধৌত করলেন। অতঃপর তার মাথা মাছেহ করলেন । তারপর তার ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন তারপর এমনি ভাবে বাম পা ধৌত করলেন। অতঃপর বললেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার এই অযূর ন্যায় অযূ করতে দেখেছি। (মুসলিম)।

উপরোল্লিখিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা অনুযায়ী মুখে পানি দিবার পূর্বে দুই হাতের কবজি ভাল করে ধৌত করতে হয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে, হাতে সাধারণতঃ ময়লা ও জীবানু থাকে। মুখে পানি দিবার পূর্বে তা যদি ভাল করে পরিস্কার না করা হয় তাহলে সেই জীবানু মুখের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞান আরও বর্ণনা করেছে যে, বেশী বেশী কুলি করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। মানুষ যখন খাদ্য খায় তখন খাদ্যাংশ দাঁতের ফাঁকে অবশিষ্ট থাকে। এ দিকে ব্যাকটরিয়া নামক ধ্বংসাত্মক ক্ষুদ্র জীবানু বাতাসের সাথে ঐ সমস্ত খাদ্য কনায় প্রবেশ করে প্রভাব বিস্তার করে। জীবানুর বংশ বিস্তার এত বেশী যে, এক একটি জীবানু প্রতি ত্রিশ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে দুইটি করে বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। এমনকি সেই নবজাত বাচ্চাটিও আবার ৩০ সেকেন্ড পর বাচ্চা দেয়ার ক্ষমতা রাখে। অথচ এই সব ক্ষুদ্র জীবানু অনুবিক্ষন যন্ত্র ছাড়া খালী চোখে দেখা যায় না। দন্ত রোগের ডাক্তারগণ বলেন, দন্ত রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যাংশ। এর মাধ্যমে জীবানু তার বংশ বিস্তার করে দাঁত ও দাঁতের মাড়ীর চরম ক্ষতি সাধন করে। শুধু তাই নয়, বরং থুতুর সাহায্যে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির সৃষ্টি করে। আমরা মুসলিম, আমাদের কাছে রয়েছে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবীর শিক্ষা, যার মধ্যে রয়েছে দ্বীন, দুনিয়ার কামিয়াবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের পূর্বে অযূর সময় ঘুম থেকে উঠে, বাড়ীতে প্রবেশের সময়, দিনের প্রথম ও শেষ ভাগে, আহারের আগে ও পরে মেসওয়াক ব্যবহার করতেন। যেমনঃ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَه عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاك عِنْدَ كُلِّ صَلاَة (متفق عليه) وفي رواية عِنْدَ كُلِّ وضُوءٍ

অর্থঃ আবু হুরায়ইরা রা. হতে বর্ণিতঃ নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের যদি কষ্ট না হতো তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাজের পূর্বে মেসওয়াক করার হুকুম করতাম। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'প্রত্যেক অযূর পূর্বে'।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ (رواه مسلم)

[1] মাসিক কাবার পথে, মে ১৯৯৮।

অর্থঃ আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন স্বীয় বাড়ীতে প্রবেশ করতেন তখন তিনি মেসওয়াক করতেন। (মুসলিম)।

عَنْ حُذَيْفَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوْصُ أَى يُدْلِكُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ (متفق عليه)

অর্থঃ হুজাইফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য জাগতেন তখন মেসওয়াক ব্যবহার করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: السِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (رواه النسائى والبيهقى)

আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মেসওয়াক মুখকে পবিত্র রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি আনায়ন করে। (নাসাঈ, বাইহাকী)।

عَنْ أَبِى مُوسى الأَشْعَرى قَالَ: دَخَلْتُ عَلى النَّبى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وطرفُ السواك على لسانه (رواه مسلم)

অর্থঃ আবু মূসা আল-আশয়ারী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম, তখন তার মুখে মেসওয়াক ছিল। (মুসলিম)। এমন আরও অনেক হাদীস পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, মানব জাতির সার্বিক সুস্থতার জন্য সদা সর্বদা তিনি মিসওয়াক করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সাথে সাথে অযূর সময় ও খাওয়ার পরেও কুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ بِالْمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ (رواه الدار قطنى)

অর্থঃ আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুলি করা ও নাকে পানি দিতে আদেশ করেছেন। (দারু কুতনী)

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে, গড়গড়া করে কুলি করার মাধ্যমে টনসিলসহ গলার অসংখ্য রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এমনকি বার বার গলায় পানি পৌছানোয় গলাকে ক্যানসার থেকে রক্ষা করে।

উপরোক্ত হাদীসে কুলি করার সাথে সাথে নাকে পানি দেয়ার আদেশ করেছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَال: إذا توضَّأَ أحدكُم فليجعلْ فى أنفه مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ (متفق عليه)

অর্থ: তোমাদের কেহ যখন অযূ করবে সে যেন অবশ্যই তার নাকে পানি দেয়, তারপর তা বের করে ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম)।

وعَنْ ابنِ عبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَنْثَرُوا مَرَّتين بَالِغَتَيْنِ أوْ ثَلاثًا (رواه أحمد وأبو داود)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেনঃ তোমরা ভাল ভাবে দুইবার অথবা তিনবার নাকে পানি দিবে। (আবূ দাউদ, আহমদ)।

নাক মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই নাকের মধ্যে এমন একটি যন্ত্র সৃষ্টি করে রেখেছেন যার মাধ্যমে মানব দেহের চির শত্রু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবানু যখন শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশের চেষ্টা করে তখন সেগুলোকে আটকে দেয়। হামলা প্রতিহত করে ও ধ্বংস করে দেয়। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা অনুযায়ী মুসল্লী ব্যক্তি কম পক্ষে দৈনিক পাঁচ বার উক্ত নাক পরিস্কার করে। এর ফলে মুসল্লী ব্যক্তিদের স্থায়ী সর্দি, কাশী কিংবা নাকে মারাত্মক ব্যাধি পরিলক্ষিত হয় না।

শায়খ আব্দুল মজীদ ঝান্দানী উল্লেখকরেনঃ জনৈক মিসরী মহিলা ডাক্তার মিসরের একটি এলাকার জরিপ চালিয়ে তথ্য প্রকাশ করেন যে, মুসল্লী ব্যক্তিদের মাঝে নাকে মারাত্মক ব্যধি পরিলক্ষিত হয় না।

American council for beauty সংস্থার সম্মানিত সদস্য লেডী হীচার বলেনঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন প্রকার রসায়নিক লোশন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই, তারা ইসলামী পন্থায় অযূ দ্বারা চেহারার যাবতীয় রোগ থেকে রক্ষা পায়। জনৈক ইউরোপীয় ডাক্তার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যার শিরোনাম ছিল "চক্ষু-পানি-সুস্থতা" (Eye- water- Health)। উক্ত প্রবন্ধে তিনি এ কথার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন যে, নিজের চক্ষুকে দিনে কয়েকবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, নতুবা মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হকে পারে। অথচ চৌদ্দশত বছর পূর্বে থেকে আল কুরআন এমন সব বিধি বিধান নির্ধারণ করেছে যার মধ্যে রয়েছে সর্ব যুগের মানব জাতির সুস্থতাসহ সার্বিক কল্যাণ।

নামাজের বিধানে বান্দার কি কল্যাণ রয়েছে?

আল্লাহর অশেষ করুনা আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে এবং আমরা আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত উপভোগ করছি। তিনি আমাদেরকে উত্তম রিয্ক দিয়েছেন, সুস্থতা দান করেছেন, সন্তান ও পরিবার পরিজন দান করেছেন, হায়াত দান করেছেন। তাঁর এই করুণা ও নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে হয়ে থাকে।
তার প্রভুত্বকে স্বীকার করে প্রথমতঃ ভাল কাজ ও করুণার স্বীকৃতি মৌখিক নয়, বরং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে করা এবং উহার প্রমাণ স্বরুপ নম্র ও বিনয়ের সাথে তাঁর জন্য সিজদায় মাথা অবনত করা।
দিতীয়তঃ এই নি'আমতগুলিকে সংরক্ষণ করা এবং উহা ঐ ভাবে ব্যবহার করা যেভাবে তিনি পছন্দ করেন।
তাই সালাত আদায় করা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার হুকুমের বাস্তবায়নে অন্তরের নির্মলতা প্রকাশ, তাঁর মহব্বত ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। এই সালাত হচ্ছে পরিণামদর্শী সুদৃঢ় কাজ, যার রয়েছে নির্দিষ্ট সময়, বিশেষ এক অবস্থা এবং উন্নত পদ্ধতি। সালাত হচ্ছে ইবাদত সমূহের মধ্যে মূল এবং সর্বোত্তম আনুগত্য। এই সালাত আদায়ে হৃদয় শান্ত হয়, অন্তর সুস্থির হয়, শরীর আরাম বোধ করে, রাগ নিস্তেজ হয়, কু-প্রবৃত্তি দমন হয়। মুসলিমদের মাঝে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, মানুষের মাঝে সমতা ও সমবেদনা আনায়ন করা, আইন শৃংখলা রক্ষা, বিনয়ী শিষ্টাচার ও হক পালনের ব্যাপারে সালাত হচ্ছে আসল হাতিয়ার।
এই সালাতের মাধ্যমে বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য ও শক্তি প্রার্থনা করে, ভাল কাজে তাঁর কাছে মদদ চায়। কঠোর দৃষ্টি অথবা কটু বাক্য অথবা নির্দয়ভাবে শক্তি প্রয়োগে যদি সৃষ্টির কারও প্রতি অনিষ্ট করে থাকে তাহলে ক্ষমা চায়।
মানব জীবনে সালাত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেমন প্রয়োজন খাদ্য ও পানীয় বস্তু। কেননা খাদ্য ও পানীয় শরীর গঠনের মূল বা প্রধান উপকরণ এবং বেঁচে থাকার উপাদান। আর সালাত হচ্ছে আত্মার প্রকৃত উপকরণ ও শান্তনা পাবার উপাদান। সালাত মানুষের চরিত্রকে সংশোধন করে, জন্মগত অভ্যাসকে পরিবর্তন করে এবং সন্দেহ ও বিশৃংখলাপূর্ণ আদি অভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাকে অশ্লীল, নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ(العنكبوت ٤٥)

অর্থঃ নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত, ২৯ঃ ৪৫ আয়াত)।
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যগত দিক দিয়েও সালাতের অনেক উপকার রয়েছে যা পবিত্রতা, অযূ, মেসওয়াক, দাঁড়ানো, রুকু, সিজদাহ ও বৈঠক থেকে আমরা পেয়ে থাকি। ডাঃ মোহাম্মদ তারেক মাহমুদ উল্লেখ করেন[2]

[2] সাসিক কাবার পথে, জুন ১৯৯৮।

নামাজ হল এক উত্তম শরীর চর্চা। অলসতা, বিষন্নতা ও বে-আমলের এই যুগ সন্ধিক্ষণে শুধুমাত্র নামাজই এমন এক ব্যয়াম, যদি একে সার্বিক পদ্ধতিতে আদায় করা হয় তাহলে এর দ্বারা ইহকালীন সকল ব্যথার উপসম সম্ভব। নামাজের ব্যয়াম যেমনভাবে বাহ্যিক অঙ্গ প্রতঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তেমনি আভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রতঙ্গ যেমন হৃৎপিন্ড, যকৃত, মূত্রাশয়, ফুসফুস, মস্তিস্ক, নাড়িভুড়ি, পাকস্থলী, মেরুদন্ড, গর্দান, সীনা ও সর্ব প্রকার Glands (দেহের রসগ্রন্থি) আবর্তিত করে শরীরকে সুঠাম ও সৌন্দর্যবান করে তোলে। আর এই ব্যয়ামগুলি এমন যার দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিপায় এক অসাধারণ শক্তি।

জনৈক ব্যক্তি (এ, আর কমর) তার ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেনঃ একদিন আমি নামাজ আদায় করছিলাম। আমার নামাজ শেষ হলে এক অমুসলিম বিশেষজ্ঞ আমাকে বলতে লাগলঃ ব্যয়ামের এই পদ্ধতি আমার বইয়ে লিখেছি এবং উল্লেখ করেছি, যে ব্যক্তি এ পদ্ধতিতে ব্যয়াম করবে সে কখনো দীর্ঘ মেয়াদী মারাত্মক ও জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না। অতঃপর এর ব্যাখ্যা এভাবে দিল যে, দন্ডায়মান ব্যক্তি যদি তৎক্ষণাৎ ব্যয়ামে গমন করে তাহলে তার স্নায়ু ও হৃদপিন্ডের উপর এর প্রভাব মঙ্গল জনক হয় না। তাই আমি স্বীয় পুস্তকে এ কথা বিশেষ ভাবে তুলে ধরেছি যে, প্রথমে দাঁড়িয়ে ব্যয়াম করবে তখন হাত বাঁধা বাঞ্ছনীয় (অর্থাৎ কিয়াম) অতঃপর মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে ব্যয়াম করতে হবে। এ ব্যয়াম কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞগণই করতে পারবে। তার মন্তব্য শুনে মুসল্লী ব্যক্তি বলতে লাগলঃ আরে! আমি আপনার পুস্তক এখনও পড়িনি; আমি একজন মুসলিম, আমার ইসলাম আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছে। আমি প্রত্যহ কমপক্ষে পাঁচবার এ রকম করে থাকি। এ কথা শুনতেই সেই ইংরেজ ব্যক্তি কিংকর্তব্য বিমুড় হয়ে তার কাছ থেকে ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা নিতে লাগল।

পাকিস্তানের একজন হৃদপিন্ডের রোগী স্বীয় রোগের চিকিৎসা করাতে অবশেষে যখন অষ্ট্রেলিয়া গিয়ে পৌছলেন তখন সেখানকার একজন হৃদপিন্ড বিশেষজ্ঞ তাকে পূর্ণ পরিদর্শনের পর তার জন্য কিছু ঔষধ ও একটি ব্যয়াম নির্ধারণ করে দিয়ে বললেনঃ আপনি আমার ফিজিও ওয়ার্ডে আমারই তত্ত্বাবধানে আট দিন পর্যন্ত উক্ত ব্যয়াম করবেন। তাকে ব্যয়াম করানোর পর দেখা গেল তা ছিল খুশু খুযু ও সন্তোষজনক এক পূর্ণাঙ্গ নামায। এবার পাকিস্তানী রোগী সেই ব্যয়ামটাকে পরিপূর্ণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সহজেই আদায় করতে লাগল। এতদ্দর্শনে ডাক্তার বললেনঃ আপনি আমার প্রথম রোগী যে এত দ্রুত আমার এই ব্যয়ামটা শিখে উত্তমভাবে তা আদায় করতে পারলেন। বস্তুতঃ এখানে আট দিনে রোগী শুধূ এ পদ্ধতিটা শিখে। এ কথা শুনে রোগী বলল, আমি হচ্ছি একজন মুসলিম, আর এ পদ্ধতি হল আমাদের পূর্ণাঙ্গ নামায। তাই এটা শিখতে আমার মোটেই বেগ পেতে হয়নি। অতঃপর দ্বিতীয় দিনেই ডাক্তার তাকে ঔষধ ও ব্যয়াম সম্পর্কে বিশেষ কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে বিদায় দিয়ে দিলেন।[3]

[3] মাসিক কাবার পথে, জুন ১৯৯৮।

রোযার বিধান কেন? রোযা কি শরীরের জন্য ক্ষতিকর?

ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইসলাম যেখানে স্বীয় অনুসারীদেরকে কিছু বিধি নিষেধ দিয়ে থাকে সেখানে হেফাযতের বিষয়ও সরবরাহ করে থাকে। ইসলাম যেমন ভাবে আমাদেরকে নামাযের নির্দেশ দিয়েছে তেমনি সাথে সাথে তাতে রেখে দিয়েছে এক সুন্দর জিন্দেগী, যেখানে রয়েছে আল্লাহর নির্দেশ তেমনি তার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য, অগণিত পার্থিব কল্যাণ।

রমযান মাসের সীয়াম সধনাকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম বান্দাদের জন্য ফরয করেছেন। তিনি বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿سورة البقرة١٨٣﴾

অর্থঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তিদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার। (সূরা বাকারা, ২ঃ ১৮৩ আয়াত)।

সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এই রোযা পালিত হয়ে থাকে। এই রোযা পালন একটি ইবাদত। তবে প্রশ্ন হল, মানুষ রোযা থেকে কি উপকার লাভ করে? যে উহা ছেড়ে দেয় সেইবা কতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হয়? তাহলে আল্লাহ কি স্বীয় বান্দাদেরকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন? অথবা আল্লাহ কি আমাদের রোযার মুক্ষাপেক্ষী? আল্লাহ বলেনঃ

أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (سورة البقرة ١٨٤)

অর্থঃ তোমাদের রোযা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৮৪ আয়াত)।

أَ لَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴿سورة الملك١٤﴾

অর্থঃ তিনি কি জানেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত। (সূরা মুলক, ৬৭ঃ ১৪ আয়াত)।

আল্লাহ তা'আলা একমাত্র নিখুঁত ভাবে অবগত আছেন যে, কোন জিনিসে মানব জাতির কল্যাণ রয়েছে এবং কোন জিনিসে অকল্যাণ রয়েছে। কোন জিনিসে তার সুস্থতা রয়েছে এবং কোন জিনিসে রয়েছে তার অসুস্থতা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ الصَّوْمُ جُنَّةٌ (فتح الباري ج ٤ ص ١٠٤)

অর্থঃ রোযা ঢাল স্বরূপ। (ফাতহুল বারী, ১০৪)। অর্থাৎ ঢাল যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাকে সার্বিক আঘাত থেকে রক্ষা করে, রোযাও তেমনি রোযাদারকে শারীরিক ও মানুসিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। অজ্ঞ শ্রেণীর অনেকেই ধারণা করে যে, রোযা রেখে সারাদিন উপবাস থাকলে শরীর অতিকায় ক্ষীণ ও জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং বিভিন্ন রোগ মানুষকে আক্রমণ করে। ঘনঘন খাদ্য গ্রহণ করলে স্বাস্থ্য অটুট ও সবল থাকার ধারণাও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নিতান্ত ভুল ও অবান্তর বলে প্রমাণিত।

মানব জীবনে খাদ্য ও পানীয় বস্তু অত্যান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা খাদ্য ও পানীয় শরীর গঠনের মূল বা প্রধান উপকরণ এবং বেঁচে থাকারও উপাদান।

মানুষ তার শরীর ও আত্মা নিয়ে গঠিত। পৃথিবীর যে সকল উপাদান রয়েছে (পানি, মাটি ও হাওয়া) তার পরিমানু দিয়ে মানুষের শরীর গঠিত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿سورةطه٥٥)

অর্থ ঃ আমি তোমাদেরকে এ মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব। এবং পুনরায় এ থেকেই তোমাদেরকে উত্থিত করব। (সূরা ত্বা-হা, ২০ঃ৫৫ আয়াত)।

পক্ষন্তরে আমরা যে খাদ্য খাই তার মধ্যেও রয়েছে হাওয়া, পানি ও মাটি। বাতাসে পাওয়া যায় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সসাইড। পানিতে রয়েছে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। এবং মাটিতে পাওয়া যায় লৌহ ধাতু, দস্তা, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, মেগনেসিয়াম, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি। এই সমস্ত উপাদানের পরমানু সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন ইত্যাদি।

মানুষের খাদ্য তার শরীরে প্রধান দুইটি কাজ করে (১) শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয় এবং তাপমাত্রা রক্ষা করে (২) কোষের কার্যক্রম রক্ষা করে এবং কোষ বিভাজনে সহায়তা করে। খাদ্য শরীরের মাঝে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে দেহকে শক্তি যোগান দিয়ে থাকে। দেহের মধ্যে সজীব উপাদানের যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় Metabolism। এই বিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে শক্তি সঞ্চয় হয় তা কোষের কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে এবং খাদ্য উপাদানগুলি সূক্ষ্ম পদক্ষেপ ও ধারাবাহিকভাবে উত্তাপের মাধ্যমে তৈরী হয় ভিটামিন, চর্বি ও সার্বিক শক্তি। সেখানে রয়েছে এমাইনো এসিড, আলোক শক্তি ও বিদ্যুৎ শক্তি। এই সমস্ত শক্তির মাধ্যমে শরীর তার বিভিন্ন যন্ত্র পরিচালনা করে যেমন হৃদপিন্ড, ফুসফুস, রক্ত পরিচালনা, পাকস্থলী ইত্যাদি। জীবন পরিচালনায় সার্বিক কাজকর্ম ও নড়াচড়ায় যথোপযোগী এই শক্তি ব্যবহার হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত শক্তি বিশেষ ভান্ডারে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত থাকে। সেখান থেকে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার হয়ে থাকে এই সংরক্ষিত শক্তি।

মানুষ যদি খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে কত দিন পর্যন্ত এই সঞ্চিত শক্তি উক্ত মানুষের প্রয়োজন মিটাতে পারে? চিকিৎসা বিজ্ঞান বর্ণনা করছেঃ মানুষ যদি খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকে সম্পূর্ণ রুপে নিজকে বিরত রাখে তা হলে তার শক্তি ভান্ডার থেকে তার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কম পক্ষে একমাস এবং উর্ধ্বে তিন মাস শক্তি সরবরাহ করতে পারে।[4]

অথচ ইসলাম মুসলিমকে দৈনিক মাত্র ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা পানাহার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে, এই সামান্য সময় পানাহার থেকে বিরত থাকা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সম্পূর্ণ নিরাপদ তাই তার শরীরে এই রোযার মাধ্যমে কোন ধরনের ক্ষতি হয় না, বরং এই রোযার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য উপকার। এই ইবাদতটির মধ্যে শুধু নৈতিক উন্নতি ও গুণাবলী অর্জনের ক্ষমতাই নেই, বরং এগুলির সাথে রয়েছে মানব দেহের সুস্থতার সম্পর্ক।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

صُوْمُوا تَصِحُّوْا (رواه الطبراني)

অর্থ ঃ রোযা রাখ, তাহলে (সওয়াব ছাড়াও) স্বাস্থ্য লাভ করবে। (তাবারানী)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ছোট্ট হাদীসটিতে লুকায়িত রয়েছে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের এক বিরাট রহস্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মানুষের কাছে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ছিল অজানা, আজ বিজ্ঞান সীয়ামের উপকারিতা বর্ণনা করে মানুষকে সীয়াম সাধনার জন্য উৎসাহিত করছে। উম্মতের বিজ্ঞান মনস্কতার উৎসাহের জন্য এ হাদীস প্রচুর ভূমিকা রাখে।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে ঃ কলেস্টেরল (Cholesterol) মানব শরীরের একটি প্রয়োজনীয় লিপিড (lipid) এটি দেহ কোষের পাতলা আবরণ গঠনের ও হজমের পিত্তরসে ব্যবহৃত হয়। এটি স্নায়ু কোষকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া মানব দেহের ইষ্ট্রজেন ও এন্ড্রোজেন নামক প্রজনন হরমোন তৈরীতে এর ভূমিকা প্রধান। এটি সকল প্রকার ষ্টেরয়েড (Steroid) সংশোধনের মূখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর পরিমান প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে উচ্চ রক্ত চাপ ও হৃদপিন্ড রোগ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলছে শরীরে কলেষ্টেরল মাত্রা সীমিত রাখতে রোযা ও রোযার মাসের পরিমিত খাদ্য গ্রহণ এবং অতিরিক্ত নামাজ যথেষ্ট সহায়ক।

সীয়াম মানুষকে ডায়াবেটিস, স্থুলকায়ত্ব ও বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। মানব দেহের অগ্নাশয়ে উৎপন্ন ইনসুলিন নামক হরমোন রক্তে মিশে রক্তের শর্করাকে জীবকোষে প্রবেশ ও কার্যকরী করতে সাহায্য করে। ইনসুলিনের অভাব হলে শরীরে শর্করা কাজে লাগতে পারে না। এর ফলে চর্বি ও প্রোটিন থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে। ফলে ডায়বেটিস রোগী দুর্বল ও ক্লান্ত হয় এবং বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। বর্তমান বিজ্ঞান বলে যে, রমজানের একমাস সীয়াম পালন এবং বছরের অন্যান্য সময় অতিরিক্ত রোযা ডায়বেটিস রোগীর রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসু। একমাস সীয়াম সাধনার কারণে অগ্নাশয় পূর্ণ বিশ্রাম পায় এবং দিনের বেলায় অগ্নাশয় থেকে ইনসুলিন

---

[4] الصيام معجزة علمية دكتور عبد الجواد الصاوي

নির্গত কম হয় বিধায় তা বিশেষ উপকারিতা লাভ করে। এছাড়া স্থুলকায়ত্ব (obesity) যা মানব দেহের বিভিন্ন রোগের কারণ তা থেকে মুক্ত করতে পারে রমযানের রোযা ও বছরের অন্যান্য রোযা। এভাবেই বিজ্ঞানীরা খুজে পেয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী রোযা রাখার মধ্যে স্বাস্থ্য লাভের প্রকৃত রহস্য[5]।

মানুষের শরীরে ক্ষতিকর বিষাক্ত উপাদানের জন্ম হয় যার অধিকাংশ খাদ্য ও পরিবেশ দুষিত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যন্ত্র চালিত যানবাহনের কারণে পরিবেশ দূষিত হওয়ার ফলে মানুষ বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে ক্যান্সার, ব্লাড প্রেসার, ফুসফুস, হার্ট ও ব্রেন টিউমার ইত্যাদি। দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, সীয়াম সাধনা শরীর ও মন উভয়ের জন্য অত্যন্ত উপকারী। প্রখ্যাত গ্রন্থ Science calls For fasting-এ বলা হয়েছে ঃ সঠিকভাবে রোযা রাখলে মনে হবে যেন দেহ নব জন্ম লাভ করেছে (After a fast properly taken, the body is literally born afresh)। চিকিৎসা বিজ্ঞানী ম্যাক ফ্যাডেন বলেছেন ঃ সীয়াম সাধনা করলে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। (The longer one fasts the greter becomes his intellectual power and the clearer his intellectual vision).

জনৈক ডাক্তার বলেনঃ প্রতিটি মানুষ রোযার মুখাপেক্ষী, যদি সে রুগী না হয়। কেননা খাদ্যের বিষাক্ত অংশ শরীরের মধ্যে জমা হতে থাকে এবং তাকে আস্তে আস্তে রুগী বানিয়ে দেয় এবং তার ওজন বাড়িয়ে দেয়, এর ফলে তার কাজের আগ্রহ উদ্দীপনা লোপ পায়। অতঃপর উক্ত মানুষটি যদি রোযা থাকে তাহলে এই সমস্ত বিষাক্ত উপাদান থেকে মুক্ত হয়ে আবার সে শক্তি ও উদ্দীপনা অনুভব করে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী এ কে এম আবদুর রহীম লিখেছেনঃ সমস্ত শরীরে সারা বছর যে জৈব বিষ দেহের স্নায়ু ও অপারপর জীব কোষকে দুর্বল করে দেয়। রোযা সমস্ত রক্ত প্রবাহকে পরিশোধন করে সমগ্র প্রবাহ প্রনালীকে নবরূপ দান করে। রোযা উর্ধ্ব রক্তচাপ জনিত ব্যাধিসমূহ দূর করতে সাহায্য করে।

সবার কাছে সুস্পষ্ট যে, বিভিন্ন মেশিন দীর্ঘ দিন কাজ করার ফলে তার মাঝে ময়লা জমার কারণে শক্তি কিছুটা কমে যায়। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দেয়। তাই সার্ভিসিং এর মাধ্যমে উক্ত ময়লাগুলো পরিস্কার করলেই পূর্বের শক্তি আবার ফিরে পায়। আর যদি তা না করা হয় তাহলে পরিশেষে উক্ত মেশিনটি অকেজো হয়ে যায়। মানুষের শরীরটাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর হুকুমে পরিচালিত একটা অলৌকিক মেশিন। এই মেশিন যেহেতু আলাদা করে সার্ভিসিং করা যায় না, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই ভাল জানেন যে, এই অলৌকিক মেশিনটি সুস্থ রাখতে হলে কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সেই সৃষ্টিকর্তা এই রোযার পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সার্বিক সুস্থ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ডাঃ জুয়েলস, ডাঃ ডিউই, ডাঃ এলেক্স হিউ প্রমুখ প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেছেন যে, রোযা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে দেহের জীবানুবর্ধক অন্ত্রগুলি ধ্বংস হয়, ইউরিক এসিড বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। রোযা চর্মরোগ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, গ্যাষ্ট্রিক আলসার ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত উপকারী বিবেচিত হয়েছে। মেদ ও কোলেষ্টরেল কমানোয় রোযার জুড়ি নেই। সর্বোপরি রোযা মনে শান্তি আনে, কুপ্রবৃত্তি প্রশমিত করে, দীর্ঘ জীবন দান করে। আজ উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন জটিল রোগের প্রশমনের ব্যবস্থা পত্রে চিকিৎকগণ রোযা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন।

চৌদ্দশত বছর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য যে কি রহমত, বরকত, ফযীলাত ও মাগফিরাতের পথ দেখিয়ে গেছেন, দিন দিন আমরা তার যর্থাতার অজস্র প্রমাণ পাচ্ছি। আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি।

[5] দৈনিক সংগ্রাম, ৪ঠা জুন ১৯৯৯।

মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত হারাম কেন?

আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষকে এত অমুল্য নিয়ামত দান করেছেন যার কোন হিসাব নিকাশ করা সম্ভব নয়। তাই স্বভাবতই তার অধিকার রয়েছে, মানুষের জন্য কোন কিছুকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করার। এ ব্যাপারে কারো কোন প্রশ্ন করার বা আপত্তি জানাবার কোন অধিকার থাকতে পারে না। তিনি রব, এ হিসাবেই তাঁর এ অধিকার। মানুষ তাঁরই বান্দা। বান্দা হিসাবেই মানুষ তাঁর এ অধিকার মেনে চলতে বাধ্য। ঠিক যেমন রব হিসাবেই তিনি মানুষকে নিজের বান্দা বানিয়েছেন এবং পালন করে চলার জন্য দিয়েছেন জিবন বিধান ও নিয়ম নীতি। তবে আল্লাহ্ যেহেতু তাঁর বান্দাদের প্রতি অপরিসীম দয়াবান এ কারণে তিনি এ ব্যাপারে কোন জবরদস্তিও যেমন করেননি তেমনি অযৌক্তিক বা বিবেকবুদ্ধি পরিপন্থী কোন বিধানও দেননি। তিনি অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত ভাবেই এক বিরাট জিনিসকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করেছেন। সার্বিক ভাবে সমগ্র মানবতার মৌলিক কল্যাণ সাধনই এর মূল লক্ষ্য। এ কারণেই তিনি মানুষের জন্য কেবল পাক-পবিত্র, উত্তম-উৎকৃষ্ট জিনিসই হালাল করেছেন এবং হারাম করেছেন যাবতীয় নিকৃষ্ট,খারাপ, ক্ষতিকর দ্রব্যাদি।[6]

জাহিলিয়াত যুগে আরবরা মৃত প্রাণী আহার করত এবং জবাইকৃত প্রাণীর চেয়ে মৃত প্রাণীর আহার করতে প্রাধান্য দিত। মৃত প্রাণীর এ ভাবেই প্রশংসা করত যে, আমরা যা মেরে ফেলেছি অর্থাৎ জবাই করেছি তার চেয়ে উত্তম আল্লাহ যা নিজ হাতে মেরেছেন। অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (سورة المائدة ٣)

অর্থঃ তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শুকরের মাংস। (সূরা মায়েদা, ৫ঃ ৩ আয়াত)।

এ হচ্ছে কুরআনের হুকুম ও আয়াত। জ্ঞান বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি হচ্ছে, ইসলামের মান তত বাড়ছে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির আবিস্কার হচ্ছে আর সৃষ্টি জগত সম্পর্কে সুক্ষ্ম তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আল্লাহ্ মৃত প্রাণী আহার করতে নিষেধ বা হারাম করলেন? বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, প্রাণীর শরীর হলো একটা দুর্গ। যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ জীবনী শক্তি ক্ষুদ্র জীবানুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে এবং জীবানুর প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা এ ধরনের যে কোন শত্রুকে প্রতিহত করে পরাজিত করতে থাকে। তাই ভিতরে তার গোস্ত ভাল, তার রক্ত ভাল, সে ভাল অবস্থায় থাকে। কিন্তু যদি মারা যায়, শুধুমাত্র এ জীবন শেষ হওয়ার কারণে পাঁচ ছয় ঘন্টা পরই এই মৃত প্রাণীটির শরীর ক্ষুদ্র জীবানুর একটা গুদামে পরিণত হয়। কেন এমন হয়? কারণ হলো শরীরে প্রাচীর রয়েছে, যা দেহকে সংরক্ষণ করে। একটা প্রাচীর নয়, বরং অনেক প্রাচীর পাকস্থলীতে ক্ষুদ্র জীবানুর হামলা থেকে শরীরকে হিফাযত করতে থাকে। সেখানে কিভাবে এই সব ক্ষুদ্র জীবানু থেকে শরীরকে রক্ষা করে?

প্রাণীর শরীরে বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু জীবানু রয়েছে। বৃহৎ অস্ত্রনালী, এমন কি প্রাণী থেকে যে মল বের হয়ে আসে সেগুলোও এই ব্যাকটেরিয়া বা ক্ষুদ্র জীবানুর বড় গুদাম। প্রাণী হতে যে মল বের হয় তা যদি পরীক্ষা করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এই মলগুলো ক্ষুদ্র জীবানু দিয়ে ভরপুর, যেন এগুলো ক্ষুদ্র জীবানুর এক একটা বড় গুদাম। অতএব এটা প্রতীয়মান হয়, এই মল যে স্থান হতে বের হয়ে এসেছে সেই স্থানেও এই সব ক্ষুদ্র জীবানু বিদ্যমান। কিন্তু এই সব জীবানু সেখানে থাকা সত্ত্বেও তারা এই পাকস্থলীর পর্দা ছেদ করে অতিক্রম করতে সক্ষম নয়।

এর কারণ হচ্ছে, সেখানে এই প্রাচীর এমন শক্তিশালী যা ক্ষুদ্র জীবানুকে শরীরে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করছে। এর প্রতিরোধ শক্তি প্রবল। তাই তারা অতিক্রম করতে সক্ষম হচ্ছে না। এই প্রতিরোধ শক্তি প্রাণীর মধ্যে সৃষ্টি করল কে? অবশ্যই বলতে হবে, সেই মহান করুণাময় আল্লাহ্। যখন কোন প্রাণী মারা যায়, তার আর জীবন থাকে না, তখন তার এই প্রাচীরের প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে যায়। ফলে এই ধ্বংসাত্মক ক্ষুদ্র জীবানু শরীরের অভ্যন্তর থেকে সেই সব পর্দা ও প্রাচীর ভেদ করে শরীরের সর্বস্থলে প্রবেশ করে। রক্তের স্থানে মিলিত হয়, সব শরীর দখল করে। অসংখ্য জীবানুর জন্ম দেয় যা

[6] ইসলামে হালাল হারামের বিধান।

মানুষের স্বাস্থ্যের বড় ধরণের ক্ষতি করতে পারে। রগ ও রক্তের অপর একটি প্রাচীর রয়েছে যা রক্তের মধ্যে এক ধরণের জীবানু রয়েছে তা গোস্তে প্রবেশ করতে বাধার সৃষ্টি করে। প্রতিটি মাংশপেশীতে প্রবেশ করতে প্রতিরোধ করছে। প্রাণী যখন মারা যায়, এই প্রাচীর ও দুর্গ ভেঙ্গে পড়ে এবং জীবানু সর্ব শরীর দখল করে ফেলে। এমনকি শরীরের যে ত্বক জীবানু প্রবেশে বাধা প্রদান করত, কিন্তু প্রাণী মারা যাওয়ার সাথে সাথে সেই পথ জীবানুর জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। এমনি ভাবে নাক, কান ও মুখ দিয়ে প্রবেশ করে মরা প্রাণী জীবানুর গুদামে পরিণত হয়ে মানুয়ের স্বাস্থের ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। জনৈক ইউরোপীয় ডাক্তার জন হানফার লারছোন বলেনঃ বর্তমানে আমাদের ইউরোপীয় আইনে সর্ব প্রকার মরা প্রাণীর গোস্ত খাওয়া নিষেধ, তাই কেউ খায় না। কখন তারা এটা জানতে পেরেছে? হ্যাঁ তারা জানতে পেরেছে তখনই, যখন এই জীবানুর পরিচয় লাভ করেছে।

রক্ত পান করা নিষেধ কেন?

মহান ধর্ম ইসলামের সকল বিধিনিষেধ যে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সম্মত এবং কল্যাণকর তা যতই দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্টতর হচ্ছে। এখানে রক্ত পান করার কথা আলোচনা করা যাক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রক্ত পান করা হারাম করলেন কেন? জবাইকৃত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া বৈধ, আর রক্ত অবৈধ কেন? জবাইকৃত একই প্রাণী থেকে যদি একটু গোস্ত ও রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করা হয় তাহলে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে যে, রক্তে অতি সহজে ও দ্রুত উৎপন্ন হতে পারে জীবানু। রক্ত হচ্ছে জীবানু উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র। অল্প সময়ের ব্যাবধানে সম্পূর্ণ রক্ত দখল করে এই সব ক্ষুদ্র জীবানু মাত্র পাঁচ-ছয় ঘন্টার মধ্যে জীবানুর গুদামে পরিণত হয়। অপর দিকে গোস্তটি এমন হতে পারে না, কারণ কি?

কারণ হল, গোস্তের উপর পর্দা রয়েছে। মাংসপেশীতেও পর্দা রয়েছে। এই পর্দাগুলি কঠিন ও শক্ত। সহজে জীবানু তা ভেদ করতে পারে না। অপর দিকে জীবানুগুলোর খাদ্য থাকে না বিধায় জীবানু বৃদ্ধি পায় না। অতএব "গোস্ত" স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতির কারণ নয়। কিন্তু রক্ত পান করা স্বাস্থের জন্য বিপদজনক, অথচ উক্ত রক্ত ও গোস্ত একই প্রাণীর। অতএব গোস্ত হালাল, আর রক্ত হারাম।

কলিজা আহার করা হালাল কেন?

রক্ত খাওয়া যদি হারাম হয় তাহলে প্রশ্ন হলোঃ কলিজা কেন হালাল? কলিজার বেশির ভাগই তো রক্ত? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ فَأَمّا الْمَيْتَتانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِحَالُ (رواه أحمد)

অর্থঃ আমাদের জন্য দু'টি মৃত প্রাণী এবং দুই প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। দুটি মৃত প্রাণী হচ্ছে মাছ ও পঙ্গপাল, আর দুই প্রকার রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্লীহা। (আহমাদ)। এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই প্রকার রক্ত বৈধ করেছেন। কলিজা ও প্লীহা। কারণ হলো, কলিজার মাঝে যে রক্ত রয়েছে তা জীবানুমুক্ত, অনুরূপ ভাবে প্লীহাতে যে রক্ত রয়েছে তাও জীবানুমুক্ত। এই দু'টি যন্ত্রের মধ্যে এমন যন্ত্র রয়েছে যার দায়িত্ব হচ্ছে রক্ত বিশুদ্ধ করণ, জীবানুমুক্ত করা ও পরিস্কার রাখা। এখানে যে রক্ত রয়েছে তা জীবানুমুক্ত ও বিশুদ্ধ।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কে শিক্ষা দিলেন এবং কে তাঁকে এই তত্ত্ব জানিয়ে দিলেন?

ইসলামে যবেহ্ করার পদ্ধতি কি নিষ্ঠুরতা?

ব্রাহ্মণ মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং কোন কোন দার্শনিক মতালম্বীদের দৃষ্টিতে পশু যবাই করা ও খাওয়া তাদের নিজেদের জন্য হারাম। উদ্ভিদ বা শাক সবজিই তাদের একমাত্র খাদ্য। কেননা তাদের মতে পশু যবাই করা নিতান্তই মর্মান্তিক ও নির্দয়তার কাজ। ওদের বাঁচার অধিকার আছে এবং সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না।

কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতির উপর দৃষ্টিপাত করলে ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, পশু যবাই করা একান্তই নির্দোষ কাজ। কেননা দুনিয়ার এসব জন্তু জানোয়ার কোন নিজস্ব স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য মূলক সৃষ্টি নয়। ওদের বুদ্ধি বিবেক ও নিজেস্ব ইচ্ছা ও বাছাই করার শক্তি বলতে কিছুই নেই। ওরা মূলতঃ মানুষের খিদমতের কাজ সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট ও নিয়োজিত। মানুষ ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণে এনে অনেক কার্য সম্পাদন করে। অনুরুপভাবে ওদেরকে যবাই করে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হলে তাতে আপত্তির কিছুই থাকতে পারে না। সৃষ্টিলোকে সদা কার্যকর আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম হচ্ছে নিকৃষ্ট ও নীচ সৃষ্টি জীব উত্তম ও উচ্চতর সৃষ্টির জন্য আত্মহুতি দিচ্ছে। সবুজ উদ্ভিতাদি জন্তু জানোয়ারের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে নিরন্তন। অনুরূপই জন্তু জানোয়ার মানুষের খাদ্যে পরিণত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মানব সমষ্টির নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিকে হত্যা করা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে রয়েছে। মানুষের জন্য পশু যবাই করা না হলে ওরা মৃত্যু ও ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারছে এমন তো নয়। অন্যান্য অধিক শক্তিশালী হিংস্র জন্তু জানোয়ার কতৃক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ওদের খাদ্যে পরিণত হওয়া তো অবধারিত। অথবা ওরা স্বভাবিক মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হবে। আর তা ওদের গলদেশে শানিত অস্ত্র চালিয়ে যবেহ্ করার তুলনায় অধিক কষ্টদায়ক হওয়া নিশ্চিত।[7]

ইসলাম প্রাণী সমূহকে খাওয়ার উপযোগী বানানোর জন্য যে মৌলিক শর্ত দিয়েছে তা হচ্ছে শরীরের সমস্ত রক্ত বের হয়ে যাওয়া। এ জন্য স্বাভাবিকভাবে ঘাড়ের সামনের দিকটার রক্ত প্রবাহের চারটির প্রধান রগ (jugulanvcins Carotid Arteries) এর সঙ্গে কণ্ঠনালীও কাটতে হবে। উক্ত প্রাণীর গলা, সামনের Artery/ ধমণী/রগগুলি কেটে ফেলার কারণে রক্তের সাথে জীবানুসহ সকল প্রকার বর্জ পদার্থ ইত্যাদি মাংশপেশীসহ অন্যান্য organ অঙ্গ প্রতঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায় না। আর এ কারণেই যবেহকৃত প্রণীর চর্বি, গোশত ও অস্থি মজ্জা তথা অন্যান্য অঙ্গ জীবানুমুক্ত থেকে যায়।[8]

এক সময় ব্রিটেনে প্রণীদের প্রতি সদয় কমিটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে আদালতে এই অভিযোগে মামলা দায়ের করে যে, মুসলিমগণ নিষ্ঠুর। কেননা, তারা জন্তুকে জবাই করে তাদেরকে কষ্ট দেয়। এ জবাইকে জুলুম আখ্যা দিয়েছিল। কোর্ট মুসলিমদেরকে জবাই করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। মুসলিমগণ এর কারণে যুলম নির্যাতন ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিমদেরকে বর্তমানেও এমন দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। আমাদের উলামা ও চিন্তাবিদদের উচিৎ বিজ্ঞানের যুক্তির মাধ্যমে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা।

একজন মানুষ যদি তার দুই হাত দিয়ে অন্য একজনের গর্দান চেপে ধরে এবং গর্দানের দু'টি 'ওদজা' নামক রগের উপর কয়েক সেকেন্ড চাপ সৃষ্টি করে রাখে তাহলে দেখা যাবে, উক্ত লোকটি অজ্ঞান হয়ে গেছে তার অনুভূতি শক্তি হারিয়ে যাবে।

প্রশ্ন হলো কেন এমন হয়?

কারণ হলো, মগজ সব সময় অক্সিজেনের ধরাবাহিক সাহায্য নিয়ে থাকে। মগজে রক্ত প্রবেশে যখন বাধার সৃষ্টি করা হয়, মাত্র কয়েক সেকেন্ড যদি রক্ত সরবরাহ বন্ধ থাকে, সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে যায়।

যদি কেহ কোন প্রাণীর যে সমস্ত রগের মাধ্যমে মগজে সাহায্য পৌঁছে থাকে ঐ সমস্ত রগগুলো চেপে ধরে তাহলে সে প্রাণীরও অনুভুতি হারিয়ে যায়। আর যদি যবেহ করার মাধ্যমে হুলকুমসহ তার

---

[7] ইসলামে হালাল হারামের বিধান।

[8] মাসিক মদীনা, অক্টোবর ২০০০, পৃষ্ঠা ৪৩।

আশেপাশে ওদাজা নামক রগগুলো হঠাৎ কেটে ফেলা হয় তাহলে সাথে সাথে জ্ঞান ও অনুভুতি শক্তি হারিয়ে যায়। যেহেতু সামান্য সময় চাপ সৃষ্টি করলেই জ্ঞানহারা হয়ে যায়, তাই যবেহ করার সাথে সাথে জ্ঞান ও অনুভুতি যে হারিয়ে যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারপর যদি উক্ত জন্তুকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয় তাহলে উহা কি কোন ব্যাথা অনুভব করে? না, কোন ধরনের ব্যাথা অনুভব সে করে না। কারণ উক্ত রগগুলো কাটা ও রক্ত বন্ধের মাধ্যমে অনুভূতির যে কেন্দ্র রয়েছে তার বিলুপ্তি ঘটে। তা হলে প্রশ্ন থেকে যায়, কেন প্রাণীটি জবেহ করার পর অনেক সময় পর্যন্ত নড়া চড়া ও পাঁ দিয়ে জোরে জোরে নাড়া দিতে থাকে? তার জবাব হচ্ছে ঃ মগজ যখন রক্তশুন্য হয়ে পড়ে তখন মগজ থেকে হৃদপিন্ডে বার্তা পাঠিয়ে দেয় যে, আমি মহা বিপদে আছি, আমার রক্ত কম হয়েছে, তোমরা রক্ত পাঠাও। এমনি ভাবে নাড়ী ভূড়ি অঙ্গ প্রতঙ্গ ও সমস্ত শরীরে বার্তা পাঠিয়ে রক্ত পাঠানোর নির্দেশ দেয়। এ খবর পাঠায় যে, রক্তের অভাবে মগজের কার্যক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে, তোমরা রক্ত পাঠাও। অতঃপর উক্ত প্রাণীটি নড়াচড়া করতে থাকে এবং যে সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গে রক্ত রয়েছে তা এই হরকত ও নড়া চড়ার মাধ্যমে হৃদপিন্ড উক্ত রক্তগুলো পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তা সেখানে পৌছতে পারে না বরং সেই কাটা রগ দিয়ে বাহিরে বের হয়ে আসে। এমনি ভাবে শরীরের সমস্ত রক্ত বাইরে বের হয়ে গোস্ত রক্তমুক্ত হয়ে যায়। এবং পরিস্কার ও পবিত্র হয়ে যায়, যা ভিতরে থাকলে মানুষের স্বাস্থের ক্ষতির কারণ হতো। এই রক্ত ভিতরে থাকলে জীবানু সম্প্রসারণে সাহায্য করতো।
আর মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি ও বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য এই পদ্ধতির ব্যবস্থা করেছেন। সুবহানাকা ইয়া রব!
এই নিয়মের খেলাফ যে কোন নিয়মে যবেহ করলে, উক্ত প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে জীবানু এবং অন্যান্য আবর্জনা থেকে যায়, যার গোসত চর্বি ইত্যাদির সাথে ভক্ষণের ফলে জটিল রোগ হতে পারে। ভারত উপমহাদেশে হিন্দুরা প্রাণীকে দাঁড় করিয়ে তার ঘাড়ের উপর তরবারীর আঘাত করে শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলত। তাদের ভাষায় একে ঝটকা বলা হয়। এরূপ গোস্তকে মহাপ্রসাদ বলা হয়। ঝটকাকালে প্রাণীর মেরুদন্ড কেটে যাওয়ার দরুন মস্তিস্কের সাথে শরীরের সম্পর্ক নিঃশেষ হয়ে যায়, ফলে তার কাটা স্থান থেকে ঐ পরিমাণ রক্তই বের হয় যা কাটা স্থানের আশেপাশে থাকে। প্রাণীর শরীরের ভিতর যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত থেকে যায়।
ইউরোপের দেশগুলোতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঝটকা পদ্ধতিতে প্রাণী বধ করা হয়। অতঃপর তারা একে নতুন আকৃতি প্রদান করে Goilatim বানাল। অর্থাৎ প্রাণীকে কাঠের ফ্রেমে দাঁড় করিয়ে উপর থেকে একটি ভারী ছোরা ফেলে শরীর থেকে মাথা আলাদা করে ফেলত। বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গেছে যে, এভাবে মেশিনে কাটা গোস্ত খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, যেহেতু তার ভিতরে রক্ত থেকে যায়। তারপর তারা পশু জবায়ের আধুনিক পদ্ধতি আবিস্কার করেছে। পশুটির মাথায় বিদ্যুতের শর্ট দেয়া হয় এবং পশুটি যখন বেহুশ হয়ে যায় তখন তার পায়ে শিকল লাগিয়ে উল্টে করে লটকে দেয়া হয়। অতঃপর ঐ বেহুশ প্রাণীর গলায় ধারাল মেশিন চালিয়ে জবাই করা হয়। এই আধুনিক পদ্ধতিতে জবাই করার ক্ষেত্রে পশুকে বেহুশ করার জন্য বিদ্যুৎশর্ট লাগানো হয়। এর কারণে হিষ্টামিনের সৃষ্টি হয় যা ভক্ষণে মানব শরীরের ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। তাই জবাই করা ইসলামী পদ্ধতি প্রাণীর জন্য আরামদায়ক এবং আহারকারীদের জন্য অধিক নিরাপদ।

শুকরের মাংস হারাম কেন?

আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সুশৃংখল নিয়ম নীতি, বিধি নিষেধ, পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা ও মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে চরম ও পরম শান্তি দিতে পারে।
আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির জন্য শুকরের মাংস খাওয়াকে সম্পূর্ণ নিষেধ ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও কিছু নির্দেশের সাথে শুকুরের মাংস খাওয়াকে হারাম ঘোষণা করে বলেনঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ (سورة البقرة ١٧٣)
তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত প্রাণী, রক্ত ও শুকরের মাংস। (সুরা বাকারা, ২ঃ ১৭৩ আয়াত)।
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (سورة الانعام ١٤٥)
অর্থঃ মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস অপবিত্র। (সুরা আনআম, ৬ঃ ১৪৫ আয়াত)।
এখানে প্রশ্ন হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেন শুকরের মাংস হারাম করলেন? কারণ হলো, জগতে যত প্রকার ক্ষতিকর জীবানু রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জীবানু ভান্ডার হলো শুকরের মাংস। তাতে রয়েছে এক প্রকার ধ্বংসাত্মক এবং মানব হত্যাকারী বিষাক্ত ও সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস। শুকরের মাংসটাই মানুষের স্বাস্থের জন্য চরম ক্ষতিকর। সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, শুকরের মাংস শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টিতে সহায়ক। তাই চিকিৎসকগণ এই ক্ষতিকর প্রাণীটির মাংস খাওয়ার ব্যাপারে মানুষকে জোরালোভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। বর্তমানে ইউরোপেও শুকরের মাংস আহার করা থেকে বিরত থাকার জন্য শক্তিশালী দাবী উঠেছে। তারা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষে শুকরের মাংস থেকে ট্রিচিনিয়াসিস (Trichineosis) নামক এক প্রকার কৃমির জন্ম দেয়, যার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের মৃত্যুও ঘটে।
ট্রিচিনেলা স্পাইরালিস Trichinella spiralis নামক সূতার মত এক প্রকার কৃমির মুককীট (Larva) রোগাক্রান্ত শুকরের মাংসে অবস্থান করে।
শুকরের মাংসের মাধ্যমে (Taenia Solium) টিনিয়া সোলিয়াম নামক অন্য এক ধরনের কৃমিও সহজে মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। কয়েক ফুট লম্বা এই ফিতা কৃমি শুকরের মাংসের ভিতরে অবস্থান করে। শুকরের মাংস ভক্ষণকারী ব্যক্তি শুকরের মাংস খাওয়ার সময় এই কৃমি সহজেই মানুষের পেটে প্রবেশ করে। কারণ এই কৃমির শুককীট (Larva) এই মাংসে পাওয়া যায়। যথেষ্ট সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা সত্তেও এই রোগে আক্রান্ত লোকের সংখা পাশ্চাত্য দেশসমূহে সর্বাধিক। এ ছাড়া এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী কোন কোন পন্ডিত ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করেন যে, শুকরের মাংস আহারকারী লজ্জা শরম হারিয়ে ফেলে। শুকরের মাংস অবৈধ হওয়ার কারণ সমূহের মধ্যে এটাও হতে পারে যা জীব বিজ্ঞানীগণ বর্ণনা করেছেন। যে প্রণীর মাংস খাওয়া হয় সেই প্রাণীর স্বভাব, যে তার মাংস খায়, তার মধ্যেও সেই স্বভাবের কিছুটা প্রতিফলন ঘটে। শুকরের স্বভাবের মধ্যে নিকৃষ্টতর স্বভাব হচ্ছে সংগম পদ্ধতি। শুকরের যখন সংগমের প্রয়োজন হয় তখন সেই দলে যতটি পুরুষ শুকর রয়েছে সবগুলোই একের পর এক ধারাবাহিক ভাবে শুকরণীকে ব্যবহার করতে থাকে। এমনকি উক্ত দলে যদি দশটি শুকরও থাকে তাহলে একটার পর আর একটা অপেক্ষা করতে থাকে। সে চলে যাবার পর, আর একটি আসে, এমনি ভাবে সবার যৌন চাহিদা মিটিয়ে নেয়। গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করলে দেখা যায়, যারা শুকরের মাংস আহার করে তাদের মাঝেও এমন স্বভাব প্রতীয়মান ও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।
এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশেষ ভাবে উল্লেখকরতে পারি আমেরিকা ও ইউরোপ দেশগুলোর কথা। সেখানে শুকরের মাংস আহার করা বৈধ। তাদের অধিকাংশ লোক শুকরের মাংস খায়। আমার মনে হয়, সে কারণেই সেই দেশগুলো যৌন-স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছে। একজন যুবতী একাধিক বয় ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরছে। যখন ইচ্ছা তখন তাদের যৌন চাহিদা মিটিয়ে নিচ্ছে। লজ্জা শরম ও ধর্মীয় কোন অনুভূতি তাদের নেই। নাইট ক্লাব, বিবাহপূর্ব যৌন মিলন, নর-নারীর অবাধ যৌন মেলামেশা এবং উলঙ্গ ক্লাব ইত্যাদি আধুনিক সৃষ্ট সভ্যতার যৌন অশ্লীলতার উজ্জল জঘন্য নিদর্শন। বিবাহের পূর্বে একজন বালিকা অন্য বন্ধু বান্ধবের সহচর্য লাভ করে এবং বিবাহরে সময় তার বিগত জীবনের ঘটনাবলী ঘটকের নিকট অপ্রকাশ রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। তার স্বজনগণও তার অন্য সঙ্গ লাভের জন্য কিছুই মনে করে না। বিবাহের সময় স্বামী যে শুধু স্ত্রীর বিগত জীবন সম্পর্কেই অবহিত হয় তাই নয়, বরং যে সমস্ত বন্ধুবর্গ তার দেহ উপভোগ করেছে, তাও স্বামী জানতে পারে। এবং এমন কার্য কলাপের প্রতি তার কোন রূপ আপত্তি থাকে না।

এমন কি তারা বিয়ে ছাড়া একত্রে বসবাস করা উত্তম মনে করে। উভয়ের মনের সাধ পরিপূর্ণ হওয়ার পর একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র কোথাও প্রেম নিবেদন করার পূর্ণ অধিকার তাদের থাকে। এমনকি মা ছেলের সাথে, পিতা মেয়ের সাথে, বোন ভাইয়ের সাথে যৌন চাহিদা মিটাতে তাদের কোন দ্বিধা দ্বন্দ নেই। যখন আমি মক্কায় অধ্যায়নরত ছিলাম তখন এক মাসিক পত্রিকায় দেখলাম, জনৈক বৃটিশ সাংবাদিক লিখেছেনঃ এক যুবতী এক যুবকের সাথে সমস্ত রাত এক রুমে অবস্থান করার পর সকাল বেলা বিদায়ের সময় যুবতী তাকে বলছেঃ ভাই! তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, তুমি আজকে যে আনন্দ আমাকে দিলে এমন আনন্দ বাবাও আমাকে দিতে পারে না। উত্তরে সে বললঃ বোন! তুমি ঠিকই বলেছ! মাও আমাকে তাই বলে।

আমাদের দেশে সাওতাল উপজাতিরা সাধারণতঃ শুকরের মাংস খেয়ে থাকে। তাদের মেয়েদেরকে কেউ যদি ধর্ষন করে এবং তা প্রকাশ পায় তাহলে কিছু জরিমানা স্বরুপ টাকা দিয়ে একটা খাওয়ার ব্যবস্থা করে। এরপর আর কোন অসুবিধা কেউ অনুভব করে না।

অন্য দিকে যদি আমরা একটু আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাই মুসলিমরা গরুর গোস্ত খায়। সৃষ্টিকর্তা তাদের জন্য হালাল বা বৈধ করেছেন।

যখন কোন গাভীর সংগমের ইচ্ছা জাগে তখন পুরুষ গরু বিভিন্ন আলামতের মাধ্যমে বুঝতে পারে এবং গাভীর কাছে ছুটে আসে। সেখানে যদি মাত্র দুইটি পুরুষ গরুর উপস্থিতি ঘটে তখন আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই সেখানে গাভীকে ব্যবহার করা বাদ দিয়ে উভয়ই পরস্পরে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করে। উভয়ের একটি পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত এমন চলতেই থাকে। একটি গরু একটি গাভী ব্যবহার করবে, আর অপরটি তাতে অংশ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, চোখ দিয়ে দেখবে এটাও গরু সহ্য করতে পারে না। এ হচ্ছে গরুর স্বভাব।

যারা প্রকৃত মুসলিম তাদের জীবন বেঁচে থাকতে স্বীয় স্ত্রী অথবা মা অথবা বোনের প্রতি অপর পুরুষ স্পর্শ করা তো দূরের কথা, বরং কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করুক এটাও তারা সহ্য করতে পারে না। ধর্মীয় বিধিবিধান তো বটেই। স্বভাবগত দিক দিয়েও এটাই সত্য।

হ্যাঁ, নামে মুসলাম অনেক রয়েছে। হালাল হারাম বিচার নেই, ধর্মীয় বিধিবিধান নেই, তাদের স্বভাব মুসলিম স্বভাবের ব্যতিক্রম হওয়াই স্বাভাবিক।

এ প্রসঙ্গে কুকুরের স্বভাবের একটি বর্ণনা তুলে ধরতে চাই। আমার এক উস্তাদ ইতিহাস থেকে একটি গল্প বলেছিলেন। আরবের জাহিলিয়াত যুগে এমন লোক ছিল যারা পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসরন করত। এক ব্যক্তির চারজন ছেলে ছিল। মৃত্যুর সময় চারজনকে ডেকে বললঃ আমি মারা যাওয়ার পর তোমাদের মাঝে যদি সম্পদ নিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি হয় তাহলে নিজেদের মাঝে ঝগড়া না করে অমুক স্থানে জনৈক ধর্ম জাযক রয়েছে, তার কাছে গিয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তোমরা কে কতটুকু পাবে তা জেনে নিবে। তাদের পিতার মৃত্যুর পর চারজন পরামর্শ করে সেই ধর্মজাযকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে যখন রাত হল তখন তারা তাবু খাটিয়ে রাত্রি যাপন করল। ভোরের দিকে কতকগুলি লোক দৌড়ে আসতে দেখে তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলঃ তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা দৌড়াচ্ছ কেন? তারা বললঃ আমাদের একটি উট ছুটে গেছে, মনে হয় এই পথে চলে গেছে। তখন লোকগুলি জিজ্ঞেস করলঃ তোমরা কারা, কোথা থেকে এসেছ এবং কি জন্য ও কোথায়ই বা যাচ্ছ? তারা জবাব দিলঃ আমরা পথিক, আরব থেকে এসেছি, অমুক ধর্মজাযকের কাছে যাব। লোকগুলি জিজ্ঞেস করলঃ তোমরা কি আমাদের উটটিকে দেখেছ? তাদের একজন বলল ঃ না আমরা দেখিনি; আচ্ছা তোমাদের উটের একটি পায়ের খুর কি ভ্গাগা ? তাদের উটটির একটি পায়ের খুর আসলেই ভাংগা ছিল। তাই তারা ভাবল, এরাই উটটি জবাই করে খেয়েছে। আর খুর ভাংগার কথা তাই তো তারা জানে।

তারা বললঃ হ্যাঁ, আমাদের সেই উটটির খুর ভাংগা ছিল। তোমরাই জবাই করে খেয়েছ, তোমাদেরকে অবশ্যই জরিমানা দিতে হবে।

তাদের অন্য ভাই বললঃ আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের উট দেখিনি। আচ্ছা, তোমাদের উটের একটি চোখ কি কানা?

আসলেই তাদের উটের একটি চক্ষু কানা ছিল। এবার তাদের বিশ্বাস আরো বেড়ে গেল যে, এরাই উটটি জবাই করে খেয়েছে তা না হলে কি করে তারা জানতে পারল যে, তাদের উটের এক চোখ কানা।

তারা বললঃ হ্যাঁ, আমাদের উটের এক চোখ কানা। অতএব তোমরাই উটটিকে জবাই করে খেয়েছ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাদের আর এক ভাই বলল ঃ আল্লাহর কসম করে বলছি! আমরা তোমাদের উট জবাই করে খাইনি। এমন কি তা আমরা আমাদের চোখেও কোন দিন দেখিনি। আচ্ছা তোমাদের উটটির মনে হয় লেজ নেই তাই না?

এবার তাদের বিশ্বাস আরও একটু গাঢ় হলো যে, তারাই আসলে উটটি জবাই করে খেয়েছে। কিন্তু জরিমানার ভয়ে স্বীকার করছে না। কারণ না দেখে উটের এমন সূক্ষ্ম ত্রুটির কথা কি করে জানলো?

তারা বললঃ হ্যাঁ, আমাদের উটের লেজ নেই, আমরা তোমাদের কসম বুঝি না, এখন বাপু তোমরা আমাদের উট কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, তাড়াতাড়ি বের করে দাও। নতুবা তোমাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

তাদের সবার বড় ভাই বললঃ আল্লাহর কসম করে আমরা বলছি যে, আমরা তোমাদের উটটি দেখিনি। কোথাও লুকিয়ে রাখিনি। আর না জবাই করে খেয়েছি। আচ্ছা তোমাদের উটটি দ্রুত গতিতে ছুটতে ছিল? আসলেই তাদের উটটি দ্রুত গতিতেই পালিয়ে গেছে। এবার তারা তাদেরকে বললঃ আমরা তোমাদেরকে আমাদের উট না দেয়া পর্যন্ত কোন ক্রমেই ছাড়তে পারি না। আর না হয় অমুক জায়গায় একজন ধর্মগুরু রয়েছে, তার কাছে চলো। তিনি যা ফায়সালা করে দেন তাই হবে।

এবার সবাই সেই ধর্মগুরুর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো। আরবের মেহমানদারী প্রবণতা সেই যুগেও ছিল। তাই তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত শোনার আগে তাদের জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলেন। তাদের জন্য কিছু আঙ্গুর, দুধ, রুটির ব্যবস্থা করলো।

তারা আঙ্গুর মুখে দিয়েই বললঃ আহ! এই আঙ্গুরগুলো যদি কবরস্থানের না হত, তাহলে কতই না ভাল হত!

রুটি খাওয়ার সময় তারা বললঃ রুটি কতই-না ভাল হত যদি সেগুলো হায়েজওয়ালী রমণী তৈরী না করত!

দুধ পান করে তারা বললঃ দুধের সম্পর্ক যদি কুকুরের সাথে না থাকত তাহলে কতই না সুস্বাদু হত!

এদিকে ধর্মগুরু পার্শ্ব থেকে তাদের কথাগুলো শুনে তার চাকরকে গিয়ে গোপনে জিজ্ঞেস করলঃ তুমি কোথা থেকে, কোন গাছের আঙ্গুর এনেছ? সে বললঃ আমি বাগানের পার্শ্বে একটি আঙ্গুরের গাছ আছে যা একটি কবর থেকে উঠেছে, সেখান থেকে এনেছি।

এবার তিনি রাখালের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ আচ্ছা তুমি কোন বকরীর দুধ মেহমানদেরকে দিয়েছ? সে বললঃ ঐ সেই বকরী যা জন্মের পর তার মা মারা যায়। তাই তাকে কুকুরের দুধ পান করিয়ে পালন করা হয়েছিল। এবার ধর্মগুরু আশ্চর্য হয়ে যে মহিলা রুটি বানিয়েছে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি বর্তমানে মাসিক অবস্থায় আছ? সে উত্তর দিলোঃ হ্যাঁ, আমি হায়েজ অবস্থায় আছি। এগুলো জানার পর ধর্মগুরু মেহমানদের খাওয়া শেষ হলে অভিযোগকারীদেরকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন।

অভীযোগকারীরা তাদের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা দিয়ে বললঃ আমাদের উট যদি তারা না দেখে থাকে তাহলে কিভাবে তরা আমাদের উটের ত্রুটিগুলি জানতে পারলো?

ধর্মগুরু তাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা যদি তাদের উট না দেখে থাক তাহলে কি করে বলেল যে, তাদের উটের ডান পায়ের একটি খুর ভাংগা? তাদের এক ভাই বললঃ জনাব! তারা যখন আমাদেরকে তাদের উটের কথা জিজ্ঞেস করছিল তখন আসে পাশে নজর করলাম। কোন উট এ পথে গেছে কিনা? আমি দেখতে পেলাম যে, একটি উট গমনের পায়ের চিহ্ন রয়েছে। তবে ডান পায়ের খুরটি ভাঙার চিহ্ন রয়েছে। তাই আমি জিজ্ঞেস করেছি যে, তাদের উটটির ডান পায়ের খুর ভাংগা কি না?

তিনি বললেনঃ এটা বুঝলাম, কিন্তু কিভাবে এটা বুঝতে পেরেছ যে, উটটি কানা?
তাদের একজন বললঃ আমি লক্ষ্য করলাম যে, সেখানে কিছু ঘাস রয়েছে। এক পাশে খেয়েছে আর অন্য পাশে খায়নি। তাই তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের উটটি কানা কিনা?
তিনি বললেনঃ এটাও না হয় বুঝলাম কিন্তু কিভাবে এটা জানতে পেরেছ যে, যে তাদের উটের লেজ নেই?
একজন বললঃ জনাব! উটের একটা স্বভাব আছে যে, মল ত্যাগ করার সময় লেজ নাড়াচাড়া করে। এর ফলে তার মল এক জায়গায় থাকে না। আমি দেখলাম যে, উটের মল এক জায়গায় রয়েছে। তাই তাদের বললাম, আমার মনে হয় তাদের উটের লেজ নেই।
তাদের উট যে দ্রুত গিয়েছে তোমরা যদি না দেখে থাক তা হলে কি করে জানলে? তাদের একজন বললঃ তারা যখন কথাবার্তা বলছিল আমি দেখলাম যে, রাস্তার ঘাসগুলো এখানে একটু খাওয়া ওখানে একটু খাওয়া। তাই তাদেরকে বলছিলাম যে, তাদের উটটি মনে হয় দ্রুত পালিয়ে গেছে।
এবার ধর্মযাজক অভিযোগকারীদের বললঃ আসলে তারা তোমাদের উট দেখেনি, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তারা এমন কথা বলেছে; তোমরা এখন চলে যেতে পার। অভিযোগকারী চলে যাবার পর ধর্মগুরু তাদেরকে প্রশ্ন করলেনঃ তোমরা কি করে জানতে পারলে যে, রুটিগুলো হায়েজওয়ালী মহিলা তৈরী করেছে? আংগুরগুলো কবরস্থান থেকে আনা হয়েছে এবং দুধের সম্পর্ক কুকুরের সাথে রয়েছে? তারা বললঃ জনাব! মহিলারা যখন পবিত্র থাকে তখন তারা ঠিকভাবে বসতে পারে এবং তাদের কাজগুলো নিপুণতার সাথে করতে পারে। আর যদি মাসিক হয় তখন ভালভাবে বসতে পারে না এবং কাজে মনোনিবেশ ঠিকভাবে দিতে পারে না। তাই রুটির অবস্থা দেখে আমরা এ কথা বলেছি।
আর সাধারণ মাটি থেকে যে আংগুর হয় সেই আংগুর হয় মিষ্টি। কবর বা কবরস্থান থেকে যে গাছ হয় তার আংগুর হয় টক। আর দুধ খেয়ে আমাদের মধ্যে এমন ভাব সৃষ্টি হয়েছিল যে, আপনার আদর ও মেহমানদারী পেয়ে আপনাকে জিহ্বা দিয়ে চেটে তার বদলা দেই। এই অনুভূতি জাগার কারণে আমরা মনে করেছিলাম যে, এটাতো কুকুরের স্বভাব। হয়তো আমরা যে দুধ খেয়েছি সেই দুধের সম্পর্ক কোন কুকুরের সাথে রয়েছে। তাই জীব বিজ্ঞানীগণ বলেন, যে প্রণীর গোস্ত অথবা দুধ খাওয়া হয় সেই প্রাণীর স্বভাব কিছুটা তাদের উপর প্রতিফলিত হয়।

মুনখানিকা কি এবং হারাম কেন?

সূরা মায়েদার তিন নং আয়াতে মুনখানিকা আহার করা হারাম বলা হয়েছে। মুনখানিকা ঐ প্রাণীকে বলা হয় যাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। প্রশ্ন হলোঃ কেন এ ধরনের প্রাণীর মাংস আহার করা হারাম করা হয়েছে?
আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে যাওয়া প্রাণী মৃত প্রাণীর ন্যায়। এটা যেন একটা বিরাট জীবানু ভান্ডারে পরিণত হয়। কেননা শ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় যখন মৃত্যু হয় তখন শরীরে রোগ জীবানু প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়, প্রতিরোধ শক্তি থাকে না। তাই রোগ জীবানুর সহায়ক হয় এবং শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গে প্রবেশ করে। পরিশেষে এ প্রাণীটি আহারকারীর জন্য মহা বিপদজনক হয়ে থাকে।

মাওকুদাহ কি ও হরাম কেন?

মাওকুদাহ ঐ জন্তুকে বলা হয়, যা লাঠি অথবা পাথরের প্রচন্ড আঘাতে নিহত হয়। এ ধরণের আঘাতজনিত মৃত প্রাণীর মাংস আহার করা ইসলামে হারাম করা হয়েছে।
এর কারণ হলঃ প্রচন্ড আঘাতে রগগুলি ফেটে যায়। রক্ত মাংসের সাথে মিশে বিষাক্ত বস্তুতে পরিণত হয়। এই বিষাক্ত বস্তু ফুলে যাওয়া স্থানে পাওয়া যায়। আমরা দেখতে পাই যে, শক্ত আঘাতের

কারণেই ঐ স্থান ফুলে যায়। রগ ফেটে যাওয়ার ফলেই এই ব্যাথা মাংস রক্তের সাথে মিশে অবস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে প্রকাশ পেয়েছে যে, শক্ত আঘাতজনিত কারণে প্রাণীর মৃত্যু ঘটলে জীবানু প্রতিরোধ শক্তি লোপ পায়, অপর দিকে তার শরীরে রক্তগুলি থেকে যায়। ফলে জীবানুর উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায় এই শরীর এবং সর্ব শরীর দখল করে এই জীবানু।

মুতারাদ্দিয়া ঐ প্রাণীকে বলে যা কোন পাহাড়, টিলা, উচু স্থান অথবা কুপে পড়ে মরে যায়।

নাতীহা ঐ প্রাণীকে বলে যা কোন প্রাণীর শিং এর আঘাতে মরে যায়। উভয় প্রকার প্রাণী ইসলামে হারাম করেছে এ কারণে যে, দেহের ভিতরে রক্ত থাকার ফলে জীবানু প্রসারের উর্বর ভূমিতে পরিণত হয় এবং জীবানু সহজে সমস্ত দেহ দখল করায় এটি একটা জীবানুর ভান্ডারে পরিণত হয়, যা ভক্ষণে মানব স্বাস্থের চরম ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। আল্লাহই ভাল জানেন।

মদ ও নেশাগ্রস্থ বস্তু হারাম কেন?

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত ধর্ম সমূহের মধ্যে একমাত্র ইসলামের এ বৈশিষ্ট রয়েছে যে, মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য করে খাওয়া দাওয়ার জিনিসকে হালাল অথবা হারামে বিভক্ত করে বিশ্ব মানবতার প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহ করেছেন।

কোন সন্দেহ নেই যে, ধর্ম, ইয্যত, জান, মাল ও আকল এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের নিরাপত্তাই হচ্ছে প্রকৃত নিরাপত্তা। মানব রচিত আইনে এই পাঁচটি বিষয়ে নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

আকলকে সংরক্ষণ করা শরীয়তের হিকমত। এ কথাটি স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয় নেশাগ্রস্থ বস্তুগুলো হারাম করা ও নেশাখোর ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থার মাধ্যমে। সবার কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, মানব জাতির কাছে ইসলামের পর সব চেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হচ্ছে আকল যার মাধ্যমে মানুষ পার্থক্য করতে পারে ভাল ও মন্দ এবং উপকারী ও অপকারী বস্তুর মাঝে।

ইসলামে হারাম দ্রব্যগুলির উপর যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, এর মধ্যে ধ্বংসাত্মক পরিণতি ছাড়া মানব জাতির কল্যাণকর কোন কিছুই নেই। যাও বা সামান্য পরিমানে রয়েছে তা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হওয়ার পূর্ব লক্ষণ। যে দ্রব্য জ্ঞান বুদ্ধি লোপ করে দেয়, নেশা সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে মানবীয় গুণাবলী এবং ধ্বংস করে দেয় সমাজ ও সভ্যতাকে সেটি হচ্ছে মদ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই জাতীয় সব জিনিস চিরদিনের জন্য হারাম করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿المائدة٩١﴾

অর্থঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার। শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত হবে না? (সূরা মায়েদা, ৫ঃ ৯০ ও ৯১ আয়াত)।

অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (سورة النساء ٢٩)

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করনা। (সূরা নিসা, ৪ঃ ২৯ আয়াত)।

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (سورة البقرة ١٩٥)

অর্থঃ তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে না। (সূরা বাকারা, ২ঃ ১৯৫ আয়াত)।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿الإسراء٧٠﴾

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। আমি তাদেরকে স্থলে ও পানিতে চলাচলের বাহন দান করেছি এবং তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা আল ইসরা, ১৭ঃ ৭০ আয়াত)।

لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَ شَارِبِهَا وحَامِلِهَاوَالْمَحْمُوْلَةِ إِلَيْهِ وَسَقِيَهاوَبَائِعَهَا وَأَكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ (رواه ابن ماجه)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদকাশক্ত ১০ ধরণের ব্যক্তির উপর লানত করেছেন। যথা (১) যে ব্যক্তি মদ জাতীয় বস্তুর নির্যাস বের করে, (২) যে ব্যক্তি মদ প্রস্তুত করে, (৩) যে ব্যক্তি মদ পান করে, (৪) যে ব্যক্তি মদ পান করায়, (৫) যে ব্যক্তি মদ আমদানী করে, (৬) যার জন্য মদ আমদানী করা হয়, (৭) মদ বিক্রেতা, (৮) মদ ক্রেতা, (৯) অন্যকে সরবরাহকারী এবং (১০) মদের লাভের অংশ ভোগকারী। (ইবনে মাজাহ)।

ইসলামের মাদক বিরোধীতা উপহাসের ব্যাপার ছিল পাশ্চাত্যের অন্যান্য জাতিগুলির কাছে। তারা নেশায় বুঁদ হয়ে তুলে ধরেছে তাদের বেহায়াপনা নোংরামী এবং নানা ধরনের সভ্যতা বিবর্জিত অমানুসিক আচরণ এবং অশালীন কর্মকান্ড। তারা ইসলামের কল্যাণকর মহান বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ যখন সমাজ সভ্যতা সব কিছুকে ধ্বংস ও গ্রাস করার জন্য মুখ ব্যাদান করে অগ্রসর হয়েছে, মাদক রাক্ষস তখন মহা আতংকে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে সারা বিশ্ব। আর এখন একে ঠেকাবার জন্য বিশ্ব ব্যাপী চলছে ব্যাপক অভিযান। একে প্রতিহত করার লড়াইয়ে ব্যয় করা হচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার প্রচারনায়।

মদের ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমে জানতে হবে শরীরের কোন কোন অঙ্গের উপর এর প্রভাব এবং কেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানব শরীরে এ নব যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলির কাজ কি?

বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গে মদের প্রতিক্রিয়া

আসুন, তা হলে প্রথমেই লক্ষ্য করা যাক স্নায়ু যন্ত্রটির প্রতি। স্নায়ু যন্ত্রটি মানব জাতির জন্য আল্লাহর নিয়ামতের মধ্যে একটি বড় মূল্যবান নিয়ামত যার দ্বারা মানুষ চিন্তা গবেষণা করে দেখে ও শ্রবণ করে এবং তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গের উপর শাসন করে। এই অনুভূতি যন্ত্রটি আল্লাহ্ একটি নিরাপদ সিন্দুকে সংরক্ষণ করেছেন। এই যন্ত্রটির রয়েছে ১৩০০ কোটি কন্ট্রোল রুম এবং সেই কন্ট্রোল রুম বা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে গোটা দেহের কোটি কোটি সেনা ও প্রহরীকে নিয়ন্ত্রণ করে।

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ (سورة لقمان ١١)

অর্থঃ এই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহ ছাড়া যারা রয়েছে তারা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। (সূরা লুকমান, ৩১ঃ ১১ আয়াত)।

পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কম্পিউটারের চেয়ে হাজার কোটি গুন জটিল এই ছোট্ট মেশিনটি। এর প্রতিটি কর্মতৎপর সেলের নাম হচ্ছে নিউরণ। প্রতি সেকেন্ডে শত শত নিউরণ এসে ব্রেইনের

প্রাথমিক স্তরে জমা হতে থাকে। এগুলো শরীরের বিভিন্ন অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, যাকে বলা হয় যোগাযোগ মন্ত্রনালয়। মূল নিয়ন্ত্রকের আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে হাজার কোটি সেলে ছড়িয়ে দেয়। আর মদের প্রভাব সর্ব প্রথম এই যন্ত্রের স্নায়ু কোষের উপর পতিত হয়ে থাকে। স্নায়ু কোষের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২০ হাজার মিলিয়ন। এই স্নায়ুকোষগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর ঠিক হয় না বা নতুন করে তৈরী হয় না, যার ফলে মানুষ অতীতের ঘটনা স্মরণ রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং কোন কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মদ ব্রেনের টিসু সেলগুলির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে বিধায় মদ্যপায়ী ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি, হিতাহিত জ্ঞান পর্যায়ক্রমে লোপ পেতে দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারোলিনা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ডঃ মালকিন কিন্সলী এবং তার সহকর্মী প্রমাণ করেছেন যে, এক গ্লাস এ্যালকোহল মগজের কিছু কোষ ধ্বংস করে বা মেরে ফেলে। মানুষ যতবার এই এ্যালকোহল পান করে ততবারই এই সর্বনাশ / ক্ষতি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

* আমেরিকার ইন্ডিয়ানা পুলিশের সংবাদ সংস্থা ইন্ডিয়ানা ইউনির্ভাসিটি মেডিকেল প্রফেসর ডাক্তার লোহর জয়ের একটি গবেষণা প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে যে, মদের নেশার প্রভাব সবচেয়ে বেশী ব্রেনের উপর পড়ে। উহা পান করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রক্তের সাথে মিশে মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পরিমাণে অল্প সেবন করলেও কু-প্রভাব থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় শক্তি উৎপাদন যন্ত্র যার নাম কালব বা হার্ট। মানব দেহের বাম পাশে সামনের দিকে পেটের একটু উপরে এই ছোট্ট অংশটি হচ্ছে মানব দেহের সর্বাধিক জরুরী অংশ।

* কালবের দৈর্ঘ হচ্ছে ১২.৫ সেন্টি মিটার, প্রস্থ হচ্ছে ৮.৫ সেন্টি মিটার।

* জন্মের সময় এর ওজন থাকে ২০-২৫ গ্রাম। পুরুষের যৌবন বা বালেগ হওয়ার সময় ওজন হয় ৩১০ গ্রাম এবং মহিলার হয় ২২৫ গ্রাম।

* হৃদযন্ত্রটি প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০টি স্পন্দনের মাধ্যমে ৫ লিটার রক্ত চালিত করে। তাতে দেখা যায়, প্রতিদিন একলক্ষ স্পন্দনের মাধ্যমে সাত হাজার দুইশত লিটার রক্ত চালিত করে। আল্লাহু আকবার!

* হৃদপিন্ডের স্পন্দনের মাধ্যমে রক্ত শিরার মধ্য দিয়ে যে দুরত্ব অতিক্রম করে তা দৈনিক একলক্ষ কিলো মিটার সম পরিমাণ।

হৃদপিন্ড থেকে ফুসফুস, তারপর ফুসফুস থেকে হৃদপিন্ড রক্ত আসা যাওয়ার সময় লাগে ছয় সেকেন্ড। হৃদপিন্ড থেকে ব্রেইন, তারপর আবার ব্রেইন থেকে হৃদপিন্ডে আসতে সময় লাগে আট সেকেন্ড। হৃদপিন্ড থেকে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে আবার হৃদপিন্ডে ফিরে আসতে সময় লাগে আঠারো সেকেন্ড। এ সংখ্যা ও সময় নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। হৃদপিন্ডের চালিকা শক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে চলছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿القمر٤٩﴾

অর্থঃ আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিত রূপে সৃষ্টি করেছি। (সূরা কামার, ৫৪ঃ ৪৯ আয়াত)।

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ (سورة النمل ٨٨)

অর্থঃ এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সব কিছুকে সুসংহত করেছেন। (সূরা নামল, ২৭ঃ ৮৮ আয়াত)।

সেই মহান সৃষ্টি কুশলী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সমস্ত অভিনব মেশিন মানুষের মাঝে স্থাপন করে প্রতিটির দায়িত্ব দিয়েছেন। আর মদ ঐ যন্ত্রের দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেনঃ মদ পানের ফলে হৃদপিন্ড সর্বশেষ মুল্যবান অনুভূতি যন্ত্রের মিলিত (Valancc) হওয়ার স্থানে ছাকনির কাজ দেয়। কিন্তু শরাব বা এ্যালকোহল এ নাজুক কাজটিকেও ব্যাহত করে। মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মাদকাশক্তির ফলে মারাত্বক স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় দেখা দেয়। নেশার মাত্রার তারতম্য হলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। হৃৎপিন্ড যখন অচল হয়ে যায় তখন দেহের অন্যান্য সব কটি যন্ত্র চালু থাকলেও মূল মানুষটিকে আর জীবন্ত বলা যায় না।

মদের ক্ষতিকর প্রভাব কলিজার উপর পতিত হয়। মানুষের কলিজা ঐ অনুভূতি গবেষণা কেন্দ্র যা শরীরের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুকেও বিষের ন্যায় অনুভূতি প্রবন করে তোলে। উভয় অঙ্গ পরস্পর একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত এবং উক্ত অঙ্গদ্বয় নেহায়েত কঠিন কাজ সম্পাদন করে।

উক্ত অঙ্গ দুটির উপর অনুভূতিশীল বিশেষ এক ধরনের আবরন থাকে। এ্যালকোহল পান করার কারণে উক্ত আবরনটির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফলে অঙ্গদ্বয় ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। অঙ্গদ্বয়ের মধ্যে ক্যান্সার সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে মদ বা এ্যালকোহলের ব্যবহারকেই ধরে নেয়া হয়েছে। শরাব পানের কারণে কলিজা সংকুচিত হয়। রক্ত উৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। তাছাড়া কলিজার ঐ শক্তি যার মাধ্যমে দেহ রক্ষাকারী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন প্রকার গ্লোবিন তৈরী, বিশেষ করে Immuno Globulin তৈরী হয়। উক্ত মদ্যপায়ীদের দেহে তা ভয়াবহ ভাবে হ্রাস পায়। ফলে এরূপ হয় যে, মদ্যপায়ীদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খর্ব হয়ে পড়ে। ফলে বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মরণ ব্যাধি এইডস, মদ পান করার কারণেও থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান আরও প্রকাশ, যে মদ পান করে তার পাকস্থলীতে ধ্বংসাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এমন কি তার পাকস্থলী প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে।

ফলে তার ক্ষুধা লাগে অত্যন্ত কম। সে জন্য তাকে অল্প আহারে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাই দিন দিন পুষ্টিহীনতায় ভুগতে হয়। শরীর শুকিয়ে যায়, ওযন কমে যায়, যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। কিডনীর মারাত্মক ক্ষতি হয়। বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে, যৌনশক্তি লোপ পাওয়াসহ যত ধরনের দূরারোগ্য ব্যাধি আছে তা মদের কারণে হয়ে থাকে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বর্তমান বিশ্বে শুধু মুসলিম দেশগুলি নয়, বরং অমুসলিম দেশগুলিও এই নেশাগ্রস্থ ধ্বংসাত্মক বস্তুর বিরুদ্ধে ভবিষ্যত বংশধরদেরকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। আমরা মুসলিম জাতি। আল্লাহর নির্দেশে দেশ ও দেশবাসীকে নেশার বিষপান থেকে বিরত রেখে ভয়াবহ রোগসমূহ থেকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

পর্দার বিধান কেন?

ইসলাম একটি বাস্তব জীবন দর্শনের নাম। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ের জন্য রয়েছে এর সুস্পষ্ট বিধি নিষেধ। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সবচেয়ে বেশী জানেন কোনটি আমাদের জন্য কল্যাণকর ও কোনটি কল্যাণকর নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রমণীকে পর্দা করা ও তার শরীরের যে সব অঙ্গ প্রকাশ করা একান্ত জরুরী নয় তা ঢেকে রাখার যখন হুকুম করেছেন তখন এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই কাজে রমণীর কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে। আর এর সাথে সাথে মঙ্গল রয়েছে সমগ্র সমাজের। ইসলামে আনুগত্যের ভিত্তি পরিপূর্ণ রূপে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রাখে, শরীয়তের আদেশ নিষেধ তারই জন্য।

একজন নারী যখন জানতে পারে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজের মধ্যে তার জন্য কি স্থান নির্ধারন করেছেন তখন তার ঈমানের দাবী এই হয় যে, সে নারী যেন সন্তুষ্ট চিত্তে ও আগ্রহ সহকারে সেই স্থান মেনে নেয় এবং নিজের নির্ধারিত সীমা লংঘন না করে।

যারা পথভ্রষ্ট ও ইসলাম ধর্ম থেকে বহির্ভূত এবং কাফিরদের চিন্তা ধারায় প্রতিপালিত, তারা সদা সর্বদা 'আধুনিক সভ্যতা থেকে মুসলিমরা পিছ পা' এ রকম ইঙ্গিত করছে। আর এমনটাই ইসলামের প্রতি তাদের ধারণা। তারা এ সমস্ত নিকৃষ্ট কথা ও কাজ দ্বারা ইসলামের রূপকে বিকৃত করছে এবং ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে মুছে দিতে চাচ্ছে। মুসলিমরা যতদিন তাদের দীনকে আঁকড়ে ধরেছিল ততদিন পর্যন্ত তাদের সভ্যতা, মান, সম্মান ও নেতৃত্ব সম্পর্কে স্বাক্ষ্য বহন করে ইতিহাস। যতদিন ইসলামী দেশগুলি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিদ্যাপিঠ ছিল ততদিন তারা প্রকৃত পক্ষে মুসলিমই ছিল।

আইয়ামে জাহিলিয়াতের অন্ধকার যুগে যখন নারীর অধিকার বলতে কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র ইসলামই তাকে দিয়েছিল অতুলনীয় সম্মান ও ঈর্ষনীয় অধিকার। সমাজ জীবনকে সুন্দর, কুলষমুক্ত

রাখার স্বার্থে, সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার স্বার্থে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে বিধি নিষেধ এসেছে। সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের জন্য প্রদত্ত হয়েছে পর্দার আদেশ যা নারী পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নারী নির্যাতনের সর্বোচ্চ ধ্বজাধারী বর্তমান সময়ে পৃথিবীর চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য যে, নারী নির্যাতন রোধে ও নারীর সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠায় পর্দা প্রথার বিকল্প নেই।

মানব প্রকৃতির মধ্যে লজ্জা প্রবনতা এক অতি স্বাভাবিক প্রবনতা। তাদের শরীরে এমন কিছু অংশ আছে যা ঢেকে রাখার ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা তার শারীরিক উপদানের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এ শারীরিক সংগঠনিক ইচ্ছাই মানুষকে আদিকাল হতে কোন না কোন প্রকারের বস্ত্র পরিধান করতে বাধ্য করেছে। কুরআনে উল্লেখ আছে, মানব শরীরের যে সকল অংশ নারী পুরুষের জন্য যৌন আকর্ষন আছে, তা প্রকাশে লজ্জা বোধ করা এবং আচ্ছাদিত রাখার চেষ্টা করা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক চাহিদা। অবশ্য শয়তানের ইচ্ছা, যেন মানুষ এ সমস্ত খোলা রাখে।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا (سورة الأعراف ٢٠)

অর্থঃ অতঃপর শয়তান আদম ও তার স্ত্রীকে প্ররোচিত করলো, যেন তাদের যে অংশ আচ্ছাদিত ছিল তা তারা উন্মুক্ত করে। (সূরা আরাফ, ৭ঃ ২০ আয়াত)।

ইসলামের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন কোন কাজকে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয় তখন সেই হারাম কাজের সব ছিদ্রপথ, যা মানুষকে হারাম কাজে পৌঁছে দেয়, তা সবই বন্ধ করে দেয়া এবং সমস্ত কাজগুলোর ফলাফল বা পরিণাম বক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে মানব সমাজে কেন এবং কি ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে তা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে হারাম ঘোষণা করে দেয়া। অতএব যে সব কাজ যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, নারী বা পুরুষকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়, নির্লজ্জ কাজে উদ্বুদ্ধ করে কিংবা তার কাছে পৌঁছে দেয় বা সে কাজ সহজতর করে দেয়, ইসলাম সেই সবই কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে এবং কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেছে। কেননা হারামের পথ থেকে রক্ষা পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না এবং কোন ক্রমেই বিপর্যয় রোধ করা যায় না। অর্থাৎ ধ্বংস অনিবার্য, তা রোধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বর্তমান বিশ্ব নারীদেরকে পণ্য হিসাবে পরিগণিত করেছে। তথাকথিত সুশিক্ষিত সুসভ্য জাতির দাবিদার এবং অগ্রগতি ও প্রগতির ধ্বজাধারীরা ইসলামে নারীদেরকে দেয়া মান সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে তাদেরকে শুধু ভোগের সামগ্রী হিসাবে বিশ্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ফলে নানা ধরনের নারী ঘটিত অপরাধ প্রবণতা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিঘ্নিত হচ্ছে নারী জাতির নিরাপত্তা।

নারীদেরকে সিনেমা, টেলিভিশন, থিয়েটার, বিজ্ঞাপন, পত্র-পত্রিকায় নগ্ন, অর্ধনগ্ন অবস্থায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। নায়ক নায়িকাদের যৌন আবেদন মূলক অশ্লীল, অশোভন অভিনয়, নাচ-গান, বেহায়াপনা, স্পর্শকাতর গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দেহ প্রদর্শন করার ফলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কুৎসিত চিন্তা চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যমে কামোদ্দীপনা সৃষ্টি করে নারীঘটিত অপরাধ বহু গুণে বাড়িয়ে তুলেছে। নারী জাতির এ বেহাল অবস্থা দর্শন করে সর্বস্তরের জনসাধারণ হারিয়ে ফেলেছে নারীদেরকে মা বোনদের মত সম্মান করার মন মানসিকতা, তারা হারাতে বাধ্য হয়েছে তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা।

ভাবতে আবাক লাগে, যারা নারী জাতির বারোটা বাঁজিয়ে ছেড়েছে তারাই আবার নারী মুক্তি আন্দোলনের জন্য সভা-সমিতি করে আকাশ বাতাশ প্রকম্পিত করে তুলছে নানা রকম ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বক্তব্য দিয়ে। নারীর আর কি মুক্তি চায় তারা? তারা তো তাদের দেশের নারীদেরকে মুক্ত ভাবে ছেড়ে দিয়ে শর্বনাশের শেষ সীমায় নামিয়ে দিয়েছে।

পাশ্চাত্য সমাজে সাম্যের এমন বর্ণনা করা হল, যে নারী ও পুরুষ নৈতিক মর্যাদা এবং মানবীয় অধিকারের দিক দিয়ে শুধু সমান নয়, বরং পুরুষ যে কাজ করে নারীও তাই করবে। সাম্যের ভ্রান্ত ধারণার জন্য অফিস, আদালত কল কারখানার চাকরী, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করে তাদের দাম্পত্য জীবনের গুরুদায়িত্ব, সন্তান প্রতিপালন

ও গৃহের সু-ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় করণীয় বিষয়গুলো নারীর কর্মসূচী হতে বাদ পড়ল। তাদের প্রকৃতিগত কাজকর্মের প্রতি ঘৃণা জন্মে গেল। সংসার জীবনের সুখ শান্তি ধ্বংস হয়ে গেল।

কেনই বা হবে না? যে নারী নিজে উপার্জন করে যাবতীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম, সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, সে শুধু যৌন সম্ভোগের জন্য পুরুষের অধীন থাকবে কেন? এর ফলে পারিবারিক শান্তি না থাকায় তাদের জীবন তিক্ত হতে তিক্ততর হচ্ছে এবং একটি চিরন্তন দুর্ভাবনা তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি দিতে পারছে না। এটাই ইহলৌকিক জাহান্নাম যা লোকেরা তাদের নির্বুদ্ধিতা ও লোভ লালসার উন্মাদনায় ক্রয় করে নেয়।

জার্মান স্যোসাল ডেমোক্রেটিক পর্টির নেতা Babel স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন "নারী এবং পুরুষ তো পশুই। পশু দম্পত্তির মধ্যে কি কখনো স্থায়ী বিবাহের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়?"

Dr Drysdaly বলেন, এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন যার দ্বারা বিবাহ ছাড়া প্রেম করাকে সম্মানজনক মনে করা যায়। ইহা আনন্দের বিষয় যে, তালাকের পন্থা শিথিল হওয়ায় বিবাহের পথ বন্ধ হয়ে আসছে। কারণ এখন বিবাহটা মিলিত জীবন যাপন করার জন্য দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি চুক্তি এবং উভয় পক্ষ যখন ইচ্ছা তখন এ চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। যৌন মিলনের এটাই একমাত্র সুষ্ঠু পন্থা।

Paul Robin লিখেছেন, বিগত পঁচিশ বছরে আমরা এতখানি সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি যে, অবৈধ সন্তানকে আমরা প্রায় বৈধ সন্তানের পর্যায়ে এনে ফেলেছি। এখন এতটুকু করার আছে যাতে এখন হতে শুধু অবৈধ সন্তান জন্ম লাভ করতে পারে।

অজ্ঞ অশিক্ষিত দূরের কথা, শিক্ষিত সমাজ এবং ধর্মীয় নেতাগণও বহু দিন পর্যন্ত এ দ্বন্দের সম্মুখীন ছিল যে, নারী প্রকৃত মানুষ কিনা, আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে কোন আত্মা দিয়েছেন কি না? হিন্দু ধর্মমতে বেদ নারীর জন্য নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্ম মতে নারীর সংগে সম্পর্ক স্থাপনকারীর জন্য নির্বাণের কোন পন্থা নেই। খ্রিষ্টান ও ইহুদী ধর্ম মতে একমাত্র নারীই মানবীয় পাপের জন্য দায়ী। গ্রীসে গৃহিণীদের শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকার ছিল না।

এ রূপ অবস্থায় আইনের দিক দিয়ে এবং মানসিক দিক দিয়ে ইসলাম একটি বিপ্লব সাধন করেছে। বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে, একজন নারী ঠিক ঐ রূপ একটি মানুষ যেমন একজন পুরুষ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا (سورة النساء ١)

অর্থ ঃ তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা একটি মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ঃ ১ আয়াত)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি তার দুটি কন্যাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে তাহলে সে ব্যক্তি এবং আমি কিয়ামতের দিন এমন ভাবে একত্রে আগমন করব যেমন আমার দুটি আঙ্গুল একত্রে আছে।

মানুষের মধ্যে যৌন বোধ সীমাহীন, অপ্রতিহত এবং অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অতি মাত্রায় বেশী। তার যৌন ক্রিয়ায় সময়ের কোন বাধা নিষেধ নৈই। তার স্বভাবের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই যে, তাকে কোন এক বিশেষ সীমারেখায় বন্ধ করে রাখতে পারে।

নিয়ন্ত্রণ ও বাধা নিষেধের দ্বারা যৌন উচ্ছৃংখলতার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, চাহিদা, বাসনা বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে পূরণ করার জন্য বলা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে, প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা।

সামাজিক নির্দেশের মধ্যে ইসলামের প্রথম কাজ নগ্নতার মূলোচ্ছেদ করা এবং নারী পুরুষের জন্য সতরের সীমারেখা নির্ধারণ করা। এ ব্যাপারে আরব জাহিলিয়াতের যে অবস্থা ছিল বর্তমান জাতিগুলোর অবস্থা প্রায় অনুরূপ। তারা একে অপরের সম্মুখে বিনা দ্বিধায় উলংগ হত, গোসল ও মল ত্যাগের সময় পর্দা করা তারা নিস্প্রয়োজন মনে করত। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কাবা ঘরের তাওয়াফ করত এবং একে তারা উৎকৃষ্ট ইবাদত মনে করত। নারীরাও তাওয়াফের সময় উলঙ্গ হয়ে যেত। তাদের স্ত্রীলোকদের পোশাক এমন হত যে, বুকের কিছু অংশ, বাহু, কোমর এবং হাটুর নীচের কিছু অংশ অনাবৃত থাকত। এ অবস্থা ইউরোপ আমেরিকা এবং জাপানে দেখা যায়। শরীরের কোন অংশ

অনাবৃত ও কোন অংশ আবৃত থাকবে তা নির্ধারণকারী সমাজ ব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশ সমূহে নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا(الأعراف ٢٦

অর্থ ঃ হে মানব সন্তান! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শরীর আবৃত করার জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছেন এবং ইহা তোমাদের শোভাবর্ধক। (সূরা আরাফ, ৭ঃ ২৬ আয়াত)।
আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ (الأحزاب ٥٩)

অর্থ ঃ হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুসলিম নারীগণকে বলে দিন, তারা যেন আপন চাদর দ্বারা নিজের ঘোমটা টেনে দেয়। এ ব্যবস্থার দ্বারা আশা করা যায় যে, তাদেরকে চিনতে পারা যাবে, অতঃপর তাদেরকে বিরক্ত করা হবে না। (সূরা আহযাব, ৩৩ঃ ৫৯ আয়াত)।
আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়তের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে মানুষের কার্যাবলী একটা নিয়ম শৃঙখলার অধীন হয়। আর এর মাধ্যমে নারীর সঠিক মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে; একটু কমও নয়, বেশীও নয়।
সমাজ সংস্কার ও উন্নতি বিধানের জন্য উভয়ের মানবিক উন্নতি, মস্তিস্ক চর্চা, বিবেক ও চিন্তাশক্তির বিকাশ সমভাবে প্রয়োজন যাতে সমাজ সেবায় প্রত্যেকে আপন আপন ভূমিকা পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে।
নারী পুরুষের কাজ করবে এটা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। এতে মানবতার মঙ্গল হতে পারেনা। আল্লাহ্ তা'আলা উভয় শ্রেণীর মধ্যে কর্ম বন্টন করে দিয়েছেন। যে সমাজ এ কর্ম বন্টনকে মেনে নিবে না, সে সাময়িক ভাবে বৈষয়িক উন্নতি ও জাকজমকের মহড়া প্রর্দশন করতে পারে; কিন্তু পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য। কারণ পুরুষের সকল আর্থিক ও সামাজিক দায়িত্ব যখন নারীর উপর ন্যাস্ত করা হবে তখন সে নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের বোঝা দূরে নিক্ষেপ করবে। ফলে এর দ্বারা শুধু সমাজই ধ্বংস হবে না, মানবতাও ধ্বংস হয়ে যাবে। একটি সাধারণ মেশিনের অংশগুলি দ্বারা যদি কেহ উহাদের প্রকৃত কাজ না করায়ে এমন কাজে লাগায় যার জন্য উহাদেরকে তৈরী করা হয়নি তাহলে সেই ব্যক্তিকে নির্বোধ ও অনভিজ্ঞ বলা হবে। এর ফলে প্রথমতঃ এ চেষ্টা নিস্ফল হবে এবং নির্মাণ কাজ সম্ভব হবে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (سورة البقرة ٢٢٣)

অর্থঃ তোমাদের নারী তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। (সুরা বাকারা, ২ঃ ২২৩ আয়াত)।
এ আয়াতে কৃষক এবং শস্য ক্ষেত্রের সঙ্গে নারী পুরুষের উপমা দেয়া হয়েছে। একজন কৃষক ও তার শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তাদের উভয়ের মধ্যেও সেই সম্পর্ক থাকা দরকার।
কৃষকের কাজ শুধুমাত্র তার ভূমিতে বীজ বপন করাই নয়। এতে পানি দেয়া, তদারক করা, রক্ষণাবেক্ষণ করারও প্রয়োজন আছে। নারী এমন শস্য ক্ষেত্র যে, কোন মানুষ পথ চলতে চলতে তাতে কোন বীজ বপন করলো, তারপর তা হতে আপনা আপনি গাছ উৎপন্ন হয়ে গেল। আসলেই যখন সেই নারী গর্ভধারণ করে তখন সে প্রকৃত পক্ষে কৃষকের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে যাতে সে তার প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছেঃ

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم ٢١)

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা শান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও করুনা স্থাপন করেছেন। (সূরা রুম, ৩০ঃ ২১ আয়াত)। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছেঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (البقرة ١٨٧)

অর্থ ঃ তারা (স্ত্রী) তোমাদের পোশাক স্বরূপ এবং তোমরা তাদের পোশাক স্বরূপ। (সূরা বাকারা, ২ঃ ১৮৭ আয়াত)।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু যৌন মিলন নয়, বরং সেই সম্পর্ক প্রেম ভালবাসার। তারা একে অপরের সুখ দুঃখের অংশীদার। তাদের মধ্যে এমন সহচার্য ও সংযোগ / সংস্পর্শ হবে যেমন হয় শরীর এবং পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে। উভয়ের মধ্যে এমন সম্পর্ক ইসলামী সমাজের ভিত্তি প্রস্তরের মত। বিবাহিতা নারী যেমন স্বামীর অধীন, ঠিক তেমনি অবিবাহিতা নারী পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তির অধীন। কিন্তু এ অধীনতার অর্থ এই নয় যে, তার ইচ্ছা এবং কাজের কোন স্বাধীনতা নেই, অথবা তার নিজের ব্যাপারে তার কোন স্বাধীনতা নেই। এর আসল মর্ম হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থাকে ফাটল ও বিশৃংখলা হতে রক্ষা করা। পরিবারের চরিত্র ও কার্যকলাপকে ভিতর ও বাহিরের বিপদ হতে রক্ষা করার দায়িত্ব পুরুষের। এই শৃংখলা রক্ষার জন্যই নারীর অপরিহার্য কর্তব্য হল, এই শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব যার সে তার আনুগত্য করবে। তা সে তার স্বামী হোক, পিতা হোক অথবা ভাই হোক।

আর নারী তার উন্নতি ও সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করবে। তবে তার উন্নতি ও সাফল্য যা কিছুই হবে তা নারী হিসাবে হতে হবে। তার পুরুষ সাজার কোন অধিকার নেই এবং পুরুষোচিত জীবন যাপনের জন্য তাকে গড়ে তোলা তার জন্য কিংবা সমাজের জন্য মঙ্গল নেই।

কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিম রমণী ইসলামী শরীয়ত থেকে প্রচুর সম্মান লাভ করেছে যা তার সতীত্ব এবং সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যথেষ্ট এবং যা তাকে উচ্চ মর্যাদা ও শীর্ষস্থান দান করে ধন্য করেছে।

ইসলামে অশ্লীল কাজ হারাম কেন এবং যিনা করায় দোষ কি?

ইসলাম হলো সার্বিক সুস্থতার পথ প্রর্দশক। সুস্থ উপায়ে বাঁচার গ্যারান্টিসহ সমস্ত জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা আছে একমাত্র ইসলামের কল্যাণকর জীবন বিধানে। কারণ ইসলাম মানব জাতির কল্যাণের জন্য যত প্রকার আদেশ নির্দেশ প্রদান করেছে তা যেমন মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রমাণ করেছে, চিরস্থায়ী সাফল্যের যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তেমনটি কোন ধর্ম বা মতবাদ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ইসলামের এই পরিপূর্ণ সাফল্যের কারণেই পবিত্র কুরআনকে মানব জীবনের পরিপূর্ণ জীবন বিধান বলা হয়।

ইসলাম শব্দটির মানেই হচ্ছে শান্তি। অর্থাৎ এর আইন কানূন, আদেশ, নিষেধ, অনূসরণ ও অনুকরণ মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় সর্বক্ষেত্রে শান্তি এবং শৃংখলা বয়ে আনে যা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্ক, বিচার বিশ্লেষণসহ একটি পরীক্ষিত সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ পৃথিবীর সকল ধর্ম, মতবাদ, চিন্তা-চেতনা, যুক্তি-তর্ক যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, সমগ্র পৃথিবীর মানব সমাজ যখন বিশৃংখলতায় নিপতিত হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল ঠিক তখনই ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে এবং কি ভাবে সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা যায় তার নিয়ম কানূন শিক্ষা দিয়ে ইসলাম পৃথিবীতে শান্তি-শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে, ইতিহাস তার জলন্ত স্বাক্ষী।

পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা তথা ইসলামী জীবন বিধান ও চিন্তা চেতনা থেকে মানুষ বহু দূরে সরে যাওয়ার কারণেই মানব সভ্যতার আজ এ অধঃপতন। তাই আজ তারা (মানবতা) লাঞ্ছিত, অপমানিত, পদদলিত হচ্ছে পদে পদে। বৈজ্ঞানিক উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি পাশ্চাত্য তথা উন্নত বিশ্বকে ঐশ্বর্য দান করেছে, প্রচুর বিত্তশালী করেছে, কিন্তু ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য সুখ সামগ্রী তাদেরকে শারীরিক এবং মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। আজ বড়ই প্রয়োজন কুরআনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণীকে বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ উজ্জ্বল আলোকে বিশ্লেষণ করে নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির জন্য অশ্লীলতা হারাম করেছেন। যিনা ও অশ্লীলতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ ﴿الاسراء٣٢﴾

তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ এবং খুবই খারাপ পথ। (সূরা আল ইসরা, ১৭ ঃ ৩২ আয়াত)।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ(الانعام ١٥١)

অর্থ ঃ লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে, উহার নিকটেও যাবে না, তা প্রকাশ্যেই হোক অথবা গোপনীয় হোক। (সুরা আনআম, ৬ঃ ১৫১ আয়াত)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

خمسٌ إذا ابتُليتُم بِهِنَّ وَ اعُوذُ بالله أنْ تُدْرِكوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ حتّى يعْلِنُوْا بِهَا الاَّ فَشَا فِيهِم الطَّاعُونُ والاوجاعُ الّتِى لم تَكُنْ مَضَتْ فِى أسلافِهِم الذين مَضَوا (رواه ابن ماجه)

অর্থ ঃ পাঁচটি জিনিস দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। সেই জিনিসগুলোর সম্মুখিন হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যখন কোন জাতির মাঝে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা প্রকাশ পায় এমনকি তা তারা ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে করতে থাকে তখন তাদের মঝে মহামারি, প্লেগ ও জনপদ বিধ্বংসী ব্যাধি দেখা দিবে যা তাদের পূর্ব পুরুষদের মাঝে ছিল না। অর্থাৎ যিনা যদি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচলিত হয়ে পড়ে তাহলে তাদের মধ্যে এমন রোগ দেখা দিবে যা আগে ছিল না। (বাইহাকী, ইবনে মাজাহ)

যদি কোন শহরে যিনা ও সুদের লেনদেন সাধারণ ভাবে প্রচলিত হতে থাকে তখন ঐ শহরবাসীর উপর আল্লাহর বিবিধ প্রকার আযাব গযব নাযিল করা হালাল হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম) যখন কোন সমাজে ব্যাপক ভাবে ব্যভিচার প্রকাশ পাবে তখন তাদের মাঝে চিকিৎসার অনুপযোগী ব্যাধিসহ মহামারী আকারে রোগ ব্যাধি দেখা দিবে। (মুয়াত্তা)।

সমকামিতার ভয়াবহ পরিণতি কি?

আমার উম্মতের মধ্যে যখন পাঁচটি জিনিস আরম্ভ হবে তখন তাদেরকে নানা প্রকার রোগ ব্যাধি ও আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হবে। তন্মধ্যে একটি হল নর নারীর মধ্যে সমমৈথুন প্রচলিত হওয়া। (আহমদ)।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিকক্রমে তিন বার বলেছেন, যে ব্যক্তি কওমে লুতের মত সমকামী কাজ করে আল্লাহ তার প্রতি লানত বর্ষণ করেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

এই আয়াত ও হাদীসগুলোর মাধ্যমে চৌদ্দ শত বছর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাণী প্রচার করে গেছেন, আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রান্তে এসে পবিত্র ধর্মের বিধানের মাঝে বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন সত্যের সন্ধান ও আশ্রয়। বর্তমান বিশ্বের প্রতি আমরা যদি নজর দেই তাহলে দেখতে পাই যে, আমেরিকা, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এমন রোগ দেখা দিয়েছে এবং তারপর তা বিভিন্ন দেশে দ্রুত প্রসার লাভ করে অল্প সময়ে হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর রোগটির সংক্ষিপ্ত নাম (AIDS) ইংরেজীতে AIDS এর পুরা বাক্য হচ্ছে Accrued Immune Deficiency Syndrome (একোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রম) আরবীতে বলা হয় انهيار وسائل الدفاع الطبيعية فى الجسم

অর্থঃ শরীরের অর্জন করা সুরক্ষিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অব্যহতি বা বিলুপ্ত হওয়া।

বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মরণ ব্যাধি এই এইডস, যার পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। ১৯৮১ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা এ রোগের খবর পেলেন। বিজ্ঞানীরা এ রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন যে, এটি একটি বদমায়েশী রোগ যা শুধু মাত্র বদমায়েশদেরকে আক্রমণ করে।

ডাঃ রবার্ট রেডিফিল্ড বলেন, AIDS is a sexully transmitted disease. অর্থাৎ এইডস হচ্ছে যৌন অনাচার থেকে সৃষ্ট রোগ।

রেডফিল্ড বলেনঃ আমাদের সমাজের (মার্কিন সমাজের) অধিকাংশ নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই নেই। কম বেশী আমরা সকলেই ইতর রতিঃপ্রবণ মানুষ হয়ে গেছি। এইডস হচ্ছে স্রষ্টার তরফ থেকে আমাদের উপর শাস্তি ও অন্যদের জন্য শিক্ষাও বটে।

আমেরিকার প্রখ্যাত গবেষক চিকিৎসক ডনডেস সারলাইস বলেনঃ বিভিন্ন ধরনের পতিতা আর তাদের পুরুষ সঙ্গীরা এইডস রোগ সৃষ্টি, লালন পালন করে এবং ছড়ায়। ডাঃ জেমস চীন বলেন, দু'হাজার সালের আগেই শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ইতর রতিঃপ্রবণতা প্রাধান্য লাভ করবে। পেশাদার পতিতা ও সৌখিন পতিতাদের সংস্পর্শে যারা যায় এবং ড্রাগ গ্রহণ করে তারাই এইডস জীবানু সৃষ্টি করে এবং তা ছড়ায়। এক কথায় অবাধ যৌনাচার, পতিতাদের সংস্পর্শ, সমকামিতার কু-অভ্যাস ও ড্রাগ গ্রহণকেই এইডসের জন্য দায়ী করা হয়।

ডঃ নজরুল ইসলাম বলেনঃ এইডস সংক্রমণের প্রধান পন্থা যৌন মিলন। শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ আক্রান্ত ব্যক্তিই এ পদ্ধতিতে আক্রান্ত হয়েছে। সারা বিশ্বের সমাজ বিজ্ঞানীসহ বিশ্বে মানবাধিকারের প্রবর্তকরা ঐ সমস্ত ভয়াবহ যৌন সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়া এবং তা দ্রুত ছড়াবার প্রধান কারণ হিসাবে সমকামিতা, বহুগামিতা এবং অবাধ যৌনচারকে চিহ্নিত করেছেন। যৌন সংক্রামক রোগগুলি যেমন এইডস, সিফিসিল, গনোরিয়া, শ্যাংক্রয়েড, লিম্ফোগ্র্যানুলোমা, ভেনেরিয়াম, ডানোভেনোসিস ও অন্যান্য। এর মধ্যে এইডস সবচেয়ে ভয়াবহ। এই রোগগুলিতে আক্রান্ত রোগীর সাথে মেলামেশা বা যৌন মিলনের মাধ্যমে সুস্থ লোক আক্রান্ত হয়। অত্যন্ত আতঙ্ক ও হতাশা সৃষ্টিকারী মরণ ব্যাধি এইডস আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে ১৯৭৯ ইং সালে সমকামী এক ব্যক্তির কাছে প্রকাশ পায়। তারপর এই ভয়াবহ রোগে যারা আক্রান্ত হতে থাকে তাদের অধিকাংশ লোকই সমকামী।

ডাঃ মুহাম্মাদ মনসুর আলী বলেন, বর্তমান কালের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি এইচ, আই, ভি। এইডস এমনই এক সময়ে সমগ্র বিশ্বে চরম আতঙ্ক এবং নিরতিশয় হতাশা সৃষ্টি করেছে যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতির অত্যুঙ্গ শিখরে অবস্থান করছে। এই মরণ ব্যাধির উৎপত্তি এবং বিস্তারের কারণ হিসাবে দেখা গেছে চরম অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি ও কুরুচিপূর্ণ সমকাম ও বহুগামীতার মত পশু সুলভ যৌন আচরণের উপস্থিতি। শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ সমকামী এবং বহুগামী পুরুষ ও মহিলাদের মাধ্যমে এইডস সমগ্র বিশ্বে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং দিন দিন এইচ, আই, ভি/ এইডস এ আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। জাপানের বাৎসরিক বিশ্ব প্রচার সংস্থা উল্লেখ করেছে যে, সেখানে অনেকের অভিমত, বিশ্বে এইডস রোগ ছড়ানোর পিছনে রয়েছে আমেরিকা।

তারা আরও উল্লেখ করেছে যে, বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়ায় এইডস রোগ বিস্তার করেছে আমেরিকাবাসী। সদা সর্বদা দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪০ হাজার আমেরিকান সৈন্য রয়েছে। রদবদল ও তাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার আমেরিকান ওখানে গমন করে।

আল উম্মাহ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ, এই রোগ বহনকারী লোকের সংখ্যা ১৪০৬ হিজরীর পরিসংখান অনুযায়ীঃ *যুক্তরাষ্ট্রে ছিল প্রায় ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ)।

* পশ্চিম জার্মানে ছিল এক লক্ষ, আর শতকারা ৯৮% জন এই রোগে আক্রান্ত রোগী অজানা অবস্থায় ছিল।

এই এইডস রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর শতকরা ৪৮ জন রোগী সাধারণতঃ ১ বছরের মধ্যে মারা যায়।[9]

বিশ্বব্যাপী এই ব্যাধি শুরু থেকে ব্যাপক আকারে দেখা দেয়া পর্যন্ত প্রায় ১৩ মিলিয়ন নারী, পুরুষ ও শিশু এইচ, আই, ভি, তে আক্রান্ত হয়েছে যা এইডস রোগের কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ২০০০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ মিলিয়ন এবং এইডস রোগীর সংখ্যা ১২ থেকে ১৮ মিলিয়ন হতে পারে। প্রতিদিন প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার লোক এইচ আই ভি, তে আক্রান্ত হচ্ছে।[10]

এই ভয়ংকর ব্যাধি আল্লাহর দেয়া বিধি নিষেধ অমান্যকারীদের উপর গযব হিসাবে দেখা দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ১ কোটি ৭০ লাখের বেশী লোক এইডস এ আক্রান্ত হয়েছে বলে বিশ্ব সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশী বিদেশী পত্র পত্রিকায় খবর পাওয়া গেছে। জুন ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত

[9] আল উম্মাহ পত্রিকা, রবিউল আখের ১৪০৬ হিজরী।

[10] ভয়ংকর মৃত্যু এইডস, পৃষ্ঠা ২০।

দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক লোক এইচ, আই, ভি, সংক্রমিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সের দুই কোটি দশ লক্ষ এ পর্যন্ত এইচ, আই, ভি, সংক্রমিত রয়েছে এবং ৪৫ লক্ষ লোক এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿الزمر٥١﴾

অর্থঃ তাদের দুস্কর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, এদের মধ্যে যারা পাপী তাদেরকেও অতি সত্ত্বর তাদের দুস্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। (সূরা জুমার, ৩৯ঃ ৫১ আয়াত)।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ (الانعام ٦٥)

অর্থঃ আপনি বলুন, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর দিক থেকে এবং তোমাদের পদতল থেকে তোমাদের উপর আজাব পাঠিয়ে দিতে সক্ষম। (সূরা আনআম, ৬ ঃ ৬৫ আয়াত)।
নিশ্চয়ই এই এইডস নামক শাস্তি যা বর্তমান বিশ্বকে ঘিরে রেখেছে তাতে শারীরিক ও মানসিক যে শাস্তি ও বেদনা রয়েছে তা আক্রান্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বেই হাজার বার হত্যা করে থাকে। জিম শ্যালী এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৭ সালে ৭ই মার্চ মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে সে বলেছেঃ আমার শরীরে একটা ভাইরাস আছে, সেটা আমার সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খেয়ে ফেলছে। মাঝে মাঝে আমি জেগে উঠি। তখন আমি ওর অস্তিত্ব টের পাই, আমাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে।
এমন কি পূরো সমাজই সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত, অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে অবস্থান করছে। কি জানি কোন সময় এই এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। আল্লাহপাক বলেন ঃ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا (سورة طه ١٢٤)

অর্থঃ যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে। (সূরা ত্বায়া-হা, ২০ঃ ১২৪ আয়াত)।

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿الحجر٧٢﴾

অর্থঃ আপনার বয়সের কসম! নিশ্চয়ই তারা আপন নেশায় হয়রান ও পেরেশান। (সূরা হিজর, ১৫ঃ ৭২ আয়াত)। অন্যত্র তিনি বলেনঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿الروم٤١﴾

অর্থঃ স্থলে ও পানিতে মানুষের কৃতকর্মের জন্য বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা রুম, ৩০ঃ ৪১ আয়াত)।
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اذَا ظَهَرَ السُّوءُ فى الارْضِ أنْزَلَ اللهُ بأْسَهُ بِأهْلِ الْاَرضِ (رواه الطبرانى)

অর্থঃ পৃথিবীতে যখন অশ্লীল কাজ প্রকাশ পায় তখন আল্লাহ দুনিয়ার অধিবাসীর প্রতি দুঃখ দুর্দশা ও হতাশা নাযিল করেন। (তাবরানী)।
১৯৮৫ ইংরেজী অপর এক পরিসংখানে বলা হয়েছে ঃ ১৪,৭৩৯ জন এইডস রোগে আক্রান্ত রুগীর মধ্যে ১০৬৫৩ জন রুগীই পুরুষ সমকামী অর্থাৎ লূত আঃ এর সম্প্রদায় যে ব্যভিচার করেছিল, মহিলা বাদ দিয়ে পুরুষে-পুরুষে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿الأعراف٨١﴾

অর্থ ঃ আমি লূতকে প্রেরণ করেছি, যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বের কেউ করেনি। তোমরা তো নারীদের ছেড়ে কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। (সূরা আরাফ, ৭ ঃ ৮০-৮১ আয়াত)।
অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿الشعراء١٦٦﴾

অর্থঃ সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? আর তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন কর। বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা আশশুয়ারা, ২৬ ঃ ১৬৫-১৬৬ আয়াত)।

এমনি ভাবে অন্যান্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা বর্বর সম্প্রদায়, সীমা অতিক্রমকারী, ফাছাদ সৃষ্টিকারী, পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী সম্প্রদায়। এগুলোর যে কোন একটি বৈশিষ্ট্যই একটি সমাজ ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

আমেরিকার মত উচ্চ শিক্ষিত সুসভ্য এবং সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হয়ে সমকামীতার মত নিকৃষ্ট ঘৃণিত মানবতা বিরোধী অশ্লীলতাকে যদি আইন করে বৈধ করে তাহলে কি ভাবে সম্ভব অশ্লীলতাসহ মানব সভ্যতা ধ্বংসের সকল ধরণের কর্মকান্ডগুলো প্রতিরোধ প্রতিহত করে বিশ্ব সমাজে মানব সভ্যতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা? কাম প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে আবদ্ধ হয়ে লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্য বিসর্জন দিয়ে পার্লামেন্টে সমকামিতা বিল পাশ করে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রকাশ্যে বৈধ ঘোষণা করেছে। ব্যভিচার যখন পার্লামেন্টে বৈধ ঘোষণা করা হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই তা সমাজে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। আর তখনই সেই সমাজ আল্লাহর গজবের উপযুক্ত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতির বিরুদ্ধে নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয় যা হারাম ও গোনাহ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। মানুষের পাশবিক ও লজ্জাকর অশোভন আচরণ যে কত দ্রুত সমাজ সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, আধুনিক শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে ভয়াবহ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তা সমস্ত বিশ্ববাসী আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ (يونس ٢٧)

অর্থঃ যারা নিকৃষ্ট বস্তু অর্জন করেছে তার বদলাও সেই পরিমাণ নিকৃষ্ট এবং অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এমন কেউ নেই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৭ আয়াত)।

আজ এইডস আতংকে সমগ্র বিশ্ব প্রকম্পিত, সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, সারা বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এই ভয়াবহ মরণব্যধি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। এই মহামারী এইডস থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে এবং করছে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা সমূলে ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা বলছে, এইডস রোগের কোন চিকিৎসা নেই। কুরআনে বর্ণিত রয়েছে ঃ

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿الشوري٤٧﴾

অর্থঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তেমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না। (সূরা শুরা, ৪২ঃ ৪৭ আয়াত)।

বর্তমান দুনিয়ায় পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, এমন কি আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে যে অশান্তি বিরাজমান রয়েছে তার কারণ হলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মেনে না চলা এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান আদর্শ অনুসরণ না করা। তাই আজকের অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি এবং বিভিন্ন জটিল, দুরারোগ্য ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হল পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ এবং যাবতীয় বিধি নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন। আর শান্তির দূত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান আর্দশের বাস্তবায়ন।

বিশ্বের এই মহা দুর্যোগের সময় ইসলামের এই ধ্রুব সত্য ও হুশিয়ারী বাণী উপলব্ধি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই WHO এ মর্মে ঘোষণা করেছে ঃ

Nothing can be more helful in this preventive effort than religious teachings and the adoption of proper and decent behavior as advocated

and urged by all divine religions (The role of Religion and ethics in the prevention and control of AIDS. (Page 3, Para 9, Published by WHO)
অর্থঃ "এইডস প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় ধর্মীয় শিক্ষাদান এবং যথাযথ নির্মল আচরণ প্রবর্তনের চেয়ে আর কোন কিছুই অধিক সহায়ক হতে পারে না যার প্রতি সকল ঐশ্বরিক ধর্মে সমর্থন প্রদান ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।" (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত দি রোল অফ রিলিজিয়ন এন্ড এথিক্স ইন দ্যা প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ এইডস নামক পুস্তিকার তৃতীয় পৃষ্ঠার নবম অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত)।
ডাঃ মোঃ মনসুর আলী বলেনঃ "এখন পর্যন্ত এইডস ভাইরাস প্রতিরোধ বা প্রতিহত করার কোন ওষধ বা টিকা আবিস্কৃত হয়নি। তাই আক্রান্ত ব্যক্তির নিরাময়েরও কোন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ এইডস এর পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। এই ভয়াবহ মরণ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে, বাঁচতে হলে অবশ্যই পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র বৈবাহিক জীবন যাপন করাই একমাত্র উপায়। এর জন্য সত্যিকার ভাবে যা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল ধর্মীয় অনুশাসন কড়াকড়ি ভাবে মেনে চলা।"
জনাব কবির উদ্দীন আহমদ এর লেখা "ভয়ঙ্কর মৃত্যু এইডস" থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় শীর্ষক গ্রন্থতে তিনি উল্লেখ করেছেনঃ "সর্ব যুগের শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বাধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম ইসলামের অনুশাসন, আচার আচরণ, বিধিনিষেধ মেনে চলার দরুন মানব জাতির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা চেতনা, দৈনন্দিন কার্য প্রণালী ও মানবিক গুণাবলীর এমনই উৎকর্ষ সাধন করে যা জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তির মধ্যে একটা প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি সৃষ্টি করে নৈতিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়, যার বলে বলীয়ান হয়ে সে সকল প্রকার লোভ লালসা, প্রলোভন, যৌন অপরাধ মূলক নানা ধরনের রিপুর তাড়না, বিভিন্ন রকমের পাশবিক আচার আচরণসহ সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অনুরাগ বা বিরাগের উর্ধ্বে উঠতে পারে, হতে পারে আত্ম সচেতন ও দৃঢ় সংযমী। মরণ ব্যাধি এইডস যেহেতু সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিহীন এবং যেহেতু দৃঢ় আত্ম সংযমই এখন পর্যন্ত এ রোগ থেকে পরিত্রানের একমাত্র রক্ষা কবচ, সেহেতু ইসলাম-সম্মত জীবন যাপন ব্যতীত এ ধ্বংসাত্মক সংক্রমণ ঠেকাবার আর কোন উপায় নেই।"
এ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগিয়ে অবাধ যৌনাচার থেকে বিরত রাখার মধ্যেই রয়েছে প্রতিবিধান। চরিত্রের উত্তম গুণাবলী দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে এইডস প্রতিরোধ করার আজকের দাবী প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর বাণী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের প্রতিধ্বনি মাত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿الانعام٨٢﴾

অর্থঃ যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনা, তাদের জন্যই শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথগামী। (সূরা আনআম, ৬ ঃ ৮২ আয়াত)।

হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমণ নিষেধ কেন?

আল্লাহর বিধানে প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য নির্ধারিত রয়েছে এক আনুপাতিক পরিমাপ। তার সকল বিধান আমাদের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছে এবং আমাদের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿البقرة٢٢٢﴾

অর্থঃ তারা তোমার কাছে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এটা এক প্রকার অসুস্থতা। অতএব তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমণ থেকে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। অতঃপর যখন তারা পবিত্রতা লাভ করে তখন তোমরা তাদের কাছে গমণ কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই যারা তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকে তাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। (সূরা বাকারা, ২ ঃ ২২২ আয়াত)।

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী একজন মুসলিম পুরুষ ও একজন মুসলিম মহিলা বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে পরস্পর হালাল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যখন সেই রমনীর হায়েয (ঋতু) শুরু হয়, এমতাবস্থায় স্বামী ব্যবহার হারাম হয়ে যায়। তবে প্রশ্ন হল হায়েয অবস্থায় কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্ত্রী সহবাস হারাম করলেন? এতে উপকার বা ক্ষতি কি? তাহলে আসুন এ ব্যাপারে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

এ নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে আমাদের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে। অতএব এতে যে মানব জাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

বান্দা যখন দাম্পত্য জীবনে মধুর মিলনে মশগুল হয়ে যাবে তখন আল্লাহর কথা স্মরণ থাকে কি না সে জন্যই এই নিষেধের ব্যবস্থা। আল্লাহ চান না যে, এক মুহূর্তের জন্যও বান্দা তাঁকে ভুলে থাকুক। রাস্তায় রেড সিগনালের ব্যবস্থা রেখেছেন যাতে চলন্ত গাড়ীর চালক সেগুলো দেখে তার গাড়ী থামিয়ে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা শুধু দাম্পত্য জীবনেই নয়, বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিধি নিষেধের ব্যবস্থা রেখেছেন। যেমন পানাহারের মধ্যে হালাল হারাম রেখেছেন তেমনি রেখেছেন ইবাদতের মধ্যে। একজন বান্দা আল্লাহর দেয়া নিয়ামত পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করবে। কিন্তু স্বীয় সৃষ্টিকর্তার কথা যাতে ভুলে না যায়, বরং প্রতি মুহূর্তে সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ করে সেজন্য খাদ্যের মধ্যে হালাল হারামের ব্যবস্থা রেখেছেন। আবার হালাল কাজগুলির কিছু কিছু রমযান মাসে দিনের বেলায় হারাম করে দিয়েছেন। নামাজ আদায় করা আল্লাহর হুকুম। আবার এমন কিছু সময় রয়েছে যে সময় নামাজ পড়া হারাম। এ মুহূর্তেও বান্দা বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহকেই স্মরণ করবে।

পূর্ণ বয়স্কা প্রত্যেক সুস্থ রমণী প্রতি চার সপ্তাহে একবার হায়েয অবস্থায় থাকে। কুরআন মেয়েদের হায়েয অবস্থাকে অসুস্থতা বলেছে এবং হায়েয অবস্থায় সহবাস থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটাকে স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করা হতো। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে, এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

ডাঃ যোয়ান গ্রাহাম লিখেছেন ঃ ঋতুর সময় রোগ ছড়াবার ও রোগাক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। কাজেই একে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শরীর বিদ্যা সম্মত (Physiological) বলা চলে না। শরীর তত্ত্ববিদগণের পর্যবেক্ষণের দ্বারা জানা যায় যে, মাসিক ঋতুকালে নারীদের মধ্যে নিম্ন লিখিত শারীরিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়ঃ

১। শরীরে তাপ সংরক্ষণ শক্তি কমে যায়। ফলে অধিক মাত্রায় শারীরিক তাপ নির্গত হয়ে তাপমাত্রা কমে যায়।

২। নাড়ী ক্ষীণ হয়ে পড়ে, রক্তের চাপ কমে যায়, শ্বাস গ্রহণের পার্থক্য দেখা যায়।

৩। স্বরণ শক্তি কমে যায় এবং কোন বিষয়ে একাগ্রতা থাকে না।

৪। স্নায়ুমণ্ডলী অবসন্ন ও অনুভূতি শক্তি শিথিল হয়।

শরীর বিজ্ঞানের ডাক্তার এমিল নুডিক বলেনঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোকের মধ্যে সাধারণতঃ যে পরিবর্তন দেখা যায় তা নিম্নরূপঃ

মাথা ব্যাথা, অবসাদ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যথা, স্নায়ুবিক দুর্বল, স্বভাবের রুক্ষতা, মুত্রণালিতে যন্ত্রণা, হযমশক্তি হ্রাস পাওয়া, কোন কোন অবস্থায় কোষ্ঠ কাঠিন্য, সময় সময় বমির ভাব এবং কোন কোন নারীর এ সময় কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে যায়।

আবার কখনো হযম শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ গোল্লাম মুয়াযযাম স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন, ঋতুর সময় স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য নীতি সম্মত ও যুক্তি ভিত্তিক। ঋতুর সময় জরায়ুর নিম্নমুখ স্বাভাবিক বন্ধ অবস্থায় থাকে না। তখন এর মুখ খোলা থাকে, ফলে রক্ত বের হতে পারে। ঋতুর রক্ত জরায়ুর গা থেকে ঝরে, কাজেই সেখানেও স্বাভাবিক অবরণ বা ঝিলি (Endometreum) অটুট থাকে না। ফলে এ সময় জরায়ু বা যোনী নালীতে কোন রোগ জীবানু থাকলে তাও সহজেই ভিতরে প্রবেশ করে এবং Endometritis (জরায়ু ঝিলি প্রদাহ) Salpingites (জরায়ুর নালীর প্রদাহ), Peritonitis (অন্ত্র আবরনী প্রদাহ) ও Pelivic Cellulite (তলপেটের প্রদাহ) ইত্যাদি কঠিন রোগ হওয়ার আশংকা

থাকে। এ সময় স্ত্রী সহবাস করলে এসব রোগের সম্ভাবনা বেশী। আবার স্ত্রীর গনেরিয়া, সিফিলিস, সিসটাইটিল (মূত্রনালী প্রদাহ), শ্বেত প্রদাহ (Leucorrhoea) ইত্যাদি রোগ থাকলে স্বামীর যৌন অঙ্গে রোগ জীবানু প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং স্বাস্থ্যগত কারণেই ঋতুর সময় সহবাস নিষিদ্ধ। তা ছাড়া যৌন মিলন নেহায়েতই উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা, সে সময় সব রকম স্বাস্থ্য বিধি পালন সম্ভব নয়। সুতরাং যখন জরায়ুর ঝিলি অটুট নয়, তখন পুরুষদের মাধ্যমে রোগ জীবানু প্রবেশের সম্ভাবনা বেশী। যদি কেউ যথেষ্ট সাবধানতা অমলম্বন করে তবুও মেয়েদের রক্তস্রাবের সময় সহবাস করা জঘন্য খুন খারাবীর মত নিকৃষ্ট মানসিক অবস্থার প্রমাণ দিবে। তাই ডাঃ গ্রাহাম বলেন যে, ঋতুর সময় মিলনে নিষেধ করার কারণ মানসিক নয়, বরং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত।

তালাকপ্রাপ্তা নারীকে তিন হায়েযকাল অপেক্ষা করতে হবে কেন?

ইসলাম ধর্মে নরীদেরকে তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর তিন হায়েয (ঋতু) পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমে ইদ্দত পালন করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (سورة البقرة ٢٢٨)

অর্থ ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয (বা তিন তহুর) পর্যন্ত। (সূরা বাকারা, ২ ঃ ২২৮ আয়াত) অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা মহিলা অন্যত্র বিয়ে করতে ইচ্ছা করলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করা মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ। ফ্রান্সের আইনে রয়েছে যে, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি বিয়ের ইচ্ছা করে তাহলে তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যুর সময় থেকে তিন শত দিন অপেক্ষা করা অত্যাবশ্যক। তবে হ্যাঁ, এর কম সময়ে যদি সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে তা আলাদা কথা। এ সময়টি প্রায় নয় মাসেরও অধিক।[11]

অনেকেই প্রশ্ন করেঃ কেন তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? এক হায়েয অথবা দুই হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই কি যথেষ্ট নয়?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আমাদেরকে নজর দিতে হবে আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দিকে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, নারীদের গর্ভবতী হওয়ার সাথে সাথে হায়েয বন্ধ হয়ে যায়। তবে কোন কোন মহিলার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে গর্ভবতী হওয়ার পরও একবার অথবা দুবার হায়েয হতে পারে, কিন্তু গর্ভাবস্থায় কোন ক্রমেই পর পর তিনবার হায়েয হতে পারে না।[12]

অতএব আমাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর নির্দেশে নারীদেরকে তিন হায়েয বা তিন তহুর পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং যুক্তি সঙ্গত। এই বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য পরবর্তী কালে সন্তানের পিতৃত্বের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়ার আশংকা দূর করা। কেননা যদি তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকে এবং তা প্রাথমিক অবস্থায় থাকে তাহলে তা ঋতু বন্ধ হয়ে গেলেই বুঝা যাবে। কিন্তু যদি পর পর তিন মাসে ঋতুস্রাব হয় তাহলে নিশ্চয়ই গর্ভে কোন সন্তান ছিল না। অতএব মানুষ এই ইদ্দতের মাধ্যমে সঠিকভাবে জানতে সক্ষম হবে যে, তার গর্ভ বাচ্চা থেকে মুক্ত।

ডাঃ মুহাম্মদ গোল্লাম মুয়াযযাম স্বীয় কিতাবে লিখেছেন ঃ তিন ঋতুর উদ্দেশ্য গর্ভ সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূর করা। কারণ গর্ভাবস্থায় প্রথম দিকে একবার কিংবা দু'বার স্রাব হতে পারে, কিন্তু তৃতীয় স্রাবের পর আর কোন সংশয় সন্দেহ থাকে না। ইহা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য বিদ্যা অনুযায়ী যুক্তি সংগত।[13]

আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিস্কারগুলির কথা কি করে এত নিখুঁতভাবে অনেক আগেই বলে দিল আল কুরআন? এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ গ্রন্থটি সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী, সর্বময়

---

11 توحيد الخالق للسيخ عبد المجيد الزنداني ص٣ ص ٢٠

12 الإسلام او الضياع للشيخ عبد المجيد الزنداني ص ٦٢

13 কুরআনে বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ৮৫।

ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী মহান রবের পক্ষ থেকে এই নির্দেশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে অবতীর্ণ।

ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুন অংশ পায় কেন?

ইসলাম শ্বাশত সত্য ও শান্তির ধর্ম। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (سورة آل عمران ١٩)

অর্থ ঃ ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। আর বিশ্ব মানবতা ও বিশ্ব নারী সমাজকে একমাত্র ইসলামই পারে শান্তি দিতে এবং তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে। আল্লাহর কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতই পারে বিশ্বের নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও অবহেলিত নারী সমাজকে পূনঃ প্রাতিষ্ঠা করতে। ইসলাম যেহেতু শান্তি ও ন্যায় বিচারের ধর্ম সেহেতু ইসলাম নারী পুরুষ কারোরই অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। কারও অধিকার হরণ এবং কাউকে অবমাননা করা ইসলাম-বিরোধী।

বর্তমান যুগে কিছু ভ্রান্ত পথভ্রষ্ট ব্যক্তি রয়েছে, তারা বলে ঃ ইসলাম মেয়েদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, যেহেতু উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম মেয়েদেরকে ছেলেদের সমান অধিকার দেয়নি। আসলে মানুষের মাঝে কিছু চালাক চতুর লোক রয়েছে যারা মেয়েদেরকে নিয়ে সদা সর্বদা তাদের কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য চক্রান্ত করছে এবং তাদেরকে ধোকা দিচ্ছে।

আসুন তাহলে দেখা যাক মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে দুর্বল ও সম্পদের বেশী মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও কেন ইসলাম ছেলেদের জন্য মেয়েদের দ্বিগুন অংশ নির্ধারণ করলো? ইসলাম শ্বাশত সত্য ও শান্তির ধর্ম। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত ইরশাদ করেন ঃ

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (سورة النساء ١١)

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। (সুরা নিসা, ৪ ঃ ১১ আয়াত)।

এই আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট করে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা উল্লেখ করে বলেন ঃ

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء١١﴾

অর্থঃ তোমরা তো জানো না যে, তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ। (সুরা নিসা, ৪ ঃ ১১ আয়াত)।

ইসলামের সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তৎকালীন আরব সমাজ ছিল বর্বর জাহিলিয়াতের সমাজ। সেই সময় নারীরা ছিল সবচেয়ে বেশী অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত। নারী সমাজকে সামাজিক ভাবে মূল্যায়ন করা হতো না। কোন পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করা হতো। দরিদ্র ও অভাবের ভয়ে ভূমিষ্ট শিশুকে মেরে ফেলা হত। জন্মদাতা যালিম পিতা শিশু সন্তানের হৃদয় বিদারক চিৎকার উপেক্ষা করে তাকে মাটিতে পুঁতে রাখত। অনেক পিতা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে দিত। সেই যুগে এমন কি মেয়েদেরকে কিছুই দেয়া হতো না এই বলে যে, তারা যুদ্ধ করত না, তারা তলোয়ার ধারণ করত না এবং শত্রুর মোকাবিলা করত না। এই সূত্র ধরে তারা পিতা মাতার ধন সম্পদেরও মালিক হতো না। আর না হতো তাদের স্বামীর অংশীদার। মেয়েরা এ ভাবেই যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হতো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্ববাসীর হিদায়েতের লক্ষ্যে চির শ্বাশত ও শান্তিপূর্ণ নির্ভেজাল বিধান দিয়ে বিশ্ব মানবের মুক্তির দূত ও আলোর দিশারী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পৃথিবীতে পাঠালেন। তিনি চৌদ্দ শত বছর পূর্বে আল্লাহর নির্দেশে নারীর হক নির্ধারণ করলেন যাতে তারা ইযযতের সাথে স্বসম্মানে তা গ্রহণ করতে পারে। করুণা কিংবা দানের ভিত্তিতে নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (سورة النساء٧)

অর্থঃ রমণীদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন যা রেখে গেছে তার মধ্যে তাদের জন্য অংশ রয়েছে। (সূরা নিসা, ৪ঃ ৭ আয়াত)।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়, যার দ্বারা সমাজে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার দ্বারা সে তার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পারে তা হলো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল আইন কানুন নারীকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল করে রেখেছে এবং সমাজে নারীর দাসত্বের কারণই হলো তার এ আর্থিক দুর্গতি। ইউরোপ এ অবস্থার অবসান চাইল এবং তার জন্য নারীকে উপার্জনশীল হিসাবে তৈরী করলো। উত্তরাধিকার সে লাভ করলো। ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের বিরাট অধিকার দান করলো। পিতা, স্বামী, সন্তান ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়ের উত্তরাধিকার সে লাভ করলো। উত্তরাধিকার আইনে নারীকে পুরুষের অর্ধেক অংশ দেয়া হয়েছে। নারী তার স্বামীর নিকট হতে মোহর ও ভরণ পোষণ পায়। পুরুষ এ সকল হতে বঞ্চিত। নারীর ভরণ পোষণ শুধু স্বামীর উপর ওয়াজিবই নয়, বরং স্বামীর অবর্তমানে পিতা, ভাই, সন্তান অথবা অন্যান্য আত্মীয় তার ভরণ পোষণ করতে বাধ্য। মেয়েদের সম্পদ লাভ করার মাধ্যমে তার উপর পূর্ণ মালিকানা ও সত্ত্ব কায়েম হয় এবং তা ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার তার, পিতা, স্বামী কিংবা অন্য কারও নেই। কোন ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করলে, অথবা নিজ শ্রম দ্বারা কোন অর্থ উপার্জন করলে তারও সে মালিক হবে। এ ছাড়াও তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বামীর। স্ত্রী যত ধনশালী হোক না কেন, তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব হতে স্বামী মুক্ত হতে পারবে না। এভাবে ইসলাম ধর্মে নারীর আর্থিক অবস্থাকে এত সুদৃঢ় করে দেয়া হয়েছে যে, অনেক সময় নারী পুরুষ অপেক্ষা বেশী ভাল অবস্থায় থাকে।

ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুন অংশ পাওয়ার কারণ হলো ঃ

* মেয়েদের ভরণ পোষণ ইত্যাদি খরচের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাদের স্বামী, ছেলেদের উপর অথবা তাদের পিতার উপর অথবা তাদের ভাইয়ের উপর অথবা তাদের অন্য কোন আত্মীয়ের উপর।
* মেয়েদের উপর অন্য কারো ভরণ পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। অথচ ছেলেদের উপর তার আত্মীয় স্বজন ও পরিবার পরিজনের খরচের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।
* ছেলেদের খরচের দায়িত্ব সর্বাধিক। অতএব মেয়েদের প্রয়োজনের তুলনায় ছেলেদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।
* ছেলেদের স্ত্রীকে মহর দিতে হয়। স্ত্রী ও সন্তানের বাসস্থান, খাদ্য ও পোষাকের খরচের দায়িত্ব পুরুষের উপরই নাস্ত।
* সন্তানের লেখা পড়ার খরচ এবং স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানের চিকিৎসার ব্যয় ভার পুরুষদেরকেই বহন করতে হয়।

মহান করুণাময় আল্লাহ আদেশ করছেনঃ

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا (سورة الطلاق ٧)

অর্থ ঃ বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমানে রিযক প্রাপ্ত সে আল্লাহ যা দিয়েছেন তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। (সূরা তালাক, ৬৫ঃ ৭ আয়াত)।

অথচ নারীরা যতই মাল ও সম্পদের অধিকারিনী হোক না কেন, তার পরও তাদের মাল থেকে খরচ করা ওয়াজিব করা হয়নি; না তাদের নিজেদের উপর, আর না তাদের সন্তানের উপর যতক্ষন পর্যন্ত তার স্বামী বেঁচে থাকবে। কেননা তার স্বামীর উপরই তার ও তার সকল সন্তানের যাবতীয় খরচের দায় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا (سورة البقرة٢٣٣)

অর্থ ঃ নিয়মানুযায়ী মাতার খাওয়া পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার দায়িত্ব। কাউকেও সামর্থের উর্ধ্বে কোন দায়িত্ব দেয়া হয় না। (সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৩৩ আয়াত)।

এমন কি মেয়েদের ছোট থেকে বিবাহ পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার তাদের পিতার। তাদের যখন বিবাহ হয় তখন থেকে তাদের দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত হয় এবং যখন বার্ধক্যে উপনিত হয় তখন তাদের সন্তানদের উপর তা ন্যস্ত হয়। এমনি ভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলাম তাদের জন্য সার্বিক ব্যয়ের ব্যবস্থা করেছেন। অপর দিকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিভিন্ন দিক থেকে তাদের অংশ নির্ধারণ করেছে।

রমনী তার পিতা মাতা থেকে পেয়ে থাকে। যেমন ঃ

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (سورة النساء ١١)

অর্থ ঃ যদি একা হয় তাহলে অর্ধেক সে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১ আয়াত)।

রমনী তার স্বামী থেকে পেয়ে থাকে। যেমন ঃ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (سورة النساء ١٢)

অর্থ ঃ তোমাদের (স্বামীর) যদি সন্তান না থাকে তাহলে তোমরা যা রেখে গেছে তার এক চতুর্থাংশ পাবে তারা (স্ত্রীরা)। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২ আয়াত)।

রমনী তার সন্তান থেকে পেয়ে থাকে। যেমন ঃ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (سورة النساء ١١)

অর্থ ঃ যদি তার সন্তান না থাকে তাহলে পিতা মাতা তার ওয়ারিস হবে। মাতা পাবে এক তৃতীয়ংশ, আর যদি তার ভাই থাকে তাহলে মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১ আয়াত)।

রমণী তার ভাই থেকে পেয়ে থাকে। যেমন ঃ

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ (سورة النساء ١٧٦)

অর্থ ঃ মৃত ব্যক্তির যদি কোন বোন থাকে তাহলে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৭৬ আয়াত)।

বিবাহের সময় নারীরা মোহর পেয়ে থাকে। যেমন ঃ

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ (سورة النساء ٤)

অর্থ ঃ তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪ আয়াত)।

ইসলাম মেয়েদেরকে তাদের কল্পনার উর্ধ্বে নিয়ামত, ফযিলাত ও সম্মান দিয়েছে। সে সম্পদ গ্রহণ করবে, কিন্তু খরচের ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা হয়নি, কোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তার লাভ আছে, ক্ষতি নেই। আয় আছে, ব্যয় নেই। জমা আছে, খরচ নেই। অতএব আদল ও ইনসাফের কষ্টি পাথরে যদি যাচাই করা হয় তাহলে সবার কাছে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হবে যে, পুরুষদের সাথে নারীদের অংশ পার্থক্য করা হয়েছে সার্বিক যুক্তিসংগত, ন্যায়ানুগ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট করা যায়। মনে করি, এক ব্যক্তির দুই সন্তান। এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে সে মৃত্যু বরণ করেছে। সে তাদের জন্য রেখে গেছে ৩০,০০০/= ত্রিশ হাজার টাকা। শরীয়াতের আলোকে মেয়েটি পাবে ১০,০০০/= দশ হাজার টাকা এবং ছেলেটি পাবে ২০, ০০০/= বিশ হাজার টাকা। বিয়ের সময় এসেছে, যুবকটি বিয়ে করতে ইচ্ছুক। তার স্ত্রীকে মহর দিতে হবে। মনে করি তার বিয়ের মহর ২০,০০০/= বিশ হাজার টাকা মাত্র। এবার সে তার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছিল তা তার স্ত্রীকে মহর হিসাবে সম্পূর্ণ প্রদান করলো। অতঃপর তার কাছে কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। বিয়ের পর বাসস্থান ও খাওয়া থাকার সার্বিক ব্যয়ের দায়িত্ব তারই। আর মেয়েটি যখন বিয়ে করার ইচ্ছা করবে তখন তার স্বামীর কাছ থেকে মোহর পাবে। মনে করি তার মোহর ২০,০০০/= বিশ হাজার টাকা। সে তার পিতার সম্পদ থেকে পেয়েছে ১০,০০০/= দশ হাজার টাকা এবং স্বামীর কাছ থেকে মোহর বাবদ পেয়েছে বিশ হাজার টাকা। তার কাছে মোট জমা হয়েছে ৩০,০০০/= ত্রিশ হাজার টাকা। সে মালদার হওয়ার পরও তার মাল থেকে খরচ করার জন্য ইসলাম তাকে কোন দায়িত্ব দেয়নি। এমন কি তার নিজের খরচের জন্যও না। কেননা তার নফছের খরচ যোগাবে তার স্বামী। বেঁচে থাকা অবস্থায় যতদিন তার দায়িত্বে থাকবে ততদিন তার উক্ত মাল বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। আর ছেলেটির মাল কমতেই থাকবে। মেয়েটি যা তার পিতার কাছ থেকে পেয়েছে তা চলে গেছে এবং ব্যয় হয়েছে।

এখন দেখুন, অর্থের দিক দিয়ে কে বেশী সৌভাগ্যের অধিকারী? ছেলেটি, না মেয়েটি? সম্পদের দিক দিয়ে কে বেশী সৌভাগ্যের অধকারী? ছেলেটি, না মেয়েটি? সম্পদের দিক দিয়ে কে বেশী মালের অধিকারী? যুবকটি, না যুবতীটি? অথচ একবিংশ শতাব্দীতে এসে নারী অধিকার আদায়ের জন্য বিশ্ব নারী দিবস, নারী স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশ্ব নারী সম্মেলন ইত্যাদি সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে মাঠে নামা সম্পূর্ণ অবান্তর মাত্র। এসব করে নারী জাতি তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও ধর্ষিত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই পাচ্ছে না।

ইসলামে কিসাসের হুকুম (জানের বদলে জান) কেন?

শরীয়তে কিসাসের মাধ্যমে নিরীহ নিস্পাপ প্রণগুলো নিরাপদ, সংরক্ষণ ও হিফাযতে থাকে। আর সেটাই স্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুটিত হয় হত্যাকারীর কিসাসের মাধ্যমে। অন্যায় ভাবে খুন করলে, খুনের বদলে খুন করার বিধান দিয়েছেন আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিসাসকে ব্যক্তি ও সমাজের জীবন বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেনঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿البقرة١٧٩﴾

অর্থ ঃ হে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা ভয় কর (সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৭৯ আয়াত)।

পৃথিবীর বেশীর দেশেই মৃত্যুর বদলে মৃত্যুর আইন প্রচলিত আছে। তবে এর প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন। একজন দোষী ব্যক্তিকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিলে অন্যরা আর সে ধরনের কাজ করতে সাহস পায় না। অর্থাৎ হত্যাকারী যদি জানতে পারে যে, সে যদি অপরকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে, এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সে এই ঘৃণিত অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। তাই এই বিরত থাকা তার যেমন জীবন, অপরের জন্যও তেমনি জীবন। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধানের মহান উদ্দেশ্য। ইসলাম এই কিসাসের মাধ্যমে হিংসা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ নিতে চায় এমন নয়, বরং এই কিসাস জীবনকে রক্ষার জন্যই।

কোন হত্যাকারী এই হুকুম জানার পরও যদি অপরকে হত্যা করে তাহলে তার অর্থ এই যে, তার দ্বারা শত শত হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব এই হত্যকারীর উপর ইসলামী আইন যদি জনসম্মুখে প্রয়োগ করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যাবে যে, শত শত জীবন রক্ষা পেয়েছে এই আইনের কারণেই। তাই আল্লাহর ভাষায় ঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴿البقرة١٧٩﴾

অর্থ ঃ কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন। (সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৭৯ আয়াত)।

এর মাধ্যমে আল্লাহ-ভীতির শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কুরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানবিক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। মানব রচিত দন্ডবিধির মত কুরআনপাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহ-ভীতি ও পরকালে বিশ্বাস উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয় যা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গোনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কুরআন পাকের এই অদ্বিতীয় পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে। সমাজ থেকে চিরতরে নির্মূল হয়েছে খুন ও সন্ত্রাস।

অপরাধীর কিসাসের মাধ্যমে পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তপাত, মারামারি হানাহানি বন্ধ হয়, যেমন বন্ধ হয়েছিল জাহিলিয়াত যুগের যুদ্ধ। বর্তমান আধুনিক যুগেও যে রক্তপাত, মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ চলছে তা সেই র্বর যুগের ঘটনাকেও অতিক্রম করে চলছে। দুই দল, দুই গোত্র, দুই সম্প্রদায় এবং

পাশাপাশি দুই দেশের মাঝে যে হিংসাত্মক যুদ্ধ, সন্ত্রাসী যুলুম ও নির্যাতন চলছে তা একমাত্র কুরআনী আইন তথা ইসলামী শাসনের অভাবেই। সীমা লংঘনকারী ও অপরাধীর সঠিক বিচার হচ্ছে না বিধায় এ পরিণাম।

আজকে যদি আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণের যুগের কথা স্মরণ করি তাহলে দেখতে পাই যে, ঐ সময় মাত্র গুটি কয়েক স্বেচ্ছা স্বীকৃত অপরাধের হদ প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেজন্য ছিল না সেখানে কোন সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারী। এমনকি যুগ যুগ ধরে চলে আসা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও বন্ধ হয়ে সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করছিল। শত্রু পরিণত হয়েছিল মিত্রে। কোথাও কোন ভয় ভীতি ছিল না। নিরাপত্তা ছিল সর্বত্র।

বর্তমান যুগেও যদি আমরা সৌদী আরবের কথা চিন্তা করি, সেখানে এই শরীয়তী কিসাসের হুকুম জারী আছে বলেই হত্যা নামের অপরাধটি নেই বললেই চলে। যা সংঘটিত হচ্ছে তাও হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র। অপর দিকে যদি আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রতি নজর করি, তা মুসলিম অধ্যুসিত দেশ হোক অথবা অমুসলিম দেশ হোক, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের কাছে হত্যা যেন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলাম বলছেঃ

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة٣٢)

অর্থ ঃ এ কারণেই আমি বণী ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারো জীবন রক্ষা করে সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। (সূরা মায়েদা, ৫ ঃ ৩২ আয়াত)।

যে দেশগুলোতে শত শত হত্যাকাণ্ড ঘটছে অথচ সেই সমস্ত দেশ থেকেই উস্কানী দেয়া হচ্ছে যে, ইসলামে হত্যার বদলে হত্যা আইনটি বর্বরতা। আমাদের দেশেও মুসলিম নামধারী কিছু লোক তাদের ছত্র ছায়ায় তাদের এজেন্ট হিসাবে এমন অপপ্রচার চালাচ্ছে। হত্যাকারী যালেম, অপরাধী, লম্পট, বদমাইশদের পক্ষ অবলম্বন করে মেকী দরদ দেখাচ্ছে। অথচ এমন অপরাধীর দ্বারা যে শত শত নিস্পাপ নিরীহ প্রাণ অন্যায় ভাবে কঠিন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে নিচ্ছে সেই মাযলুমদের পক্ষে একবারও রহম বা দরদ দেখাচ্ছে না। তাদের কর্ণকুহরে তাদের সন্তান ও বিধবাদের আর্তনাদ, আহাজারী ও চিৎকার পৌঁছে না, যারা তাদের অভিভাবককে হারিয়ে ফেলায় এক মুঠো খাদ্য পাচ্ছে না, তাদের দেখা শুনার কেউ নেই। তাদের জীবন যাপন কতই না কষ্ট সাধ্যে পরিণত হয়েছে সেই চিন্তা কি তারা কখনও করেছে? অপরাধী ছাড়া কেউ অপরাধীর পক্ষ অবলম্বন করে না।

একটি অন্যায়কারী অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে শত শত জীবন রক্ষায় ইসলাম যেমন নফছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে, তেমনি সকল সমাজে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিচ্ছে, যেহেতু এই আইন সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে।

চোরের হাত কাটার আইন কেন?

ইসলাম মুসলিমদের সম্পদের নিরাপত্তা দিয়েছে। প্রত্যেকেই তার জীবনের প্রয়োজন নিটানোর উদ্দেশ্যে বৈধ পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। আল কুরআনের ভাষায় ঃ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿القصص٧٧﴾

অর্থঃ আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তার মাধ্যমে পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর। দুনিয়াতে তোমার অংশ ভুলে যেও না। আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তেমনি তুমি অনুগ্রহ কর। পৃথিবীতে ফাছাদ সৃষ্টি করতে প্রয়সী হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাছাদ সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা কাছাছ, ২৮ ঃ ৭৭ আয়াত)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿الملك١٥﴾

অর্থ ঃ তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব তোমরা তাতে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযক আহার কর এবং তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবিত হবে। (সূরা মুলক, ৬৭ ঃ ১৫ আয়াত)।

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এমন পন্থা অবলম্বন করা যা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে ফায়দা দিবে। যদি কারো আর্থিক ক্ষমতা হারিয়ে যায়, তার কোন সাহায্যকারী না থাকে এবং পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এমন কেউ না থাকে যে, তার খরচের ভার বহন করবে, এমতাবস্থায় তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ধনীদের মালের জাকাত থেকে গ্রহণ করা ফরয করে দিয়েছেন। অর্থাৎ ধনীরা তাদের ফরয দায়িত্ব পালন করতে এসব অভাবগ্রস্থকে দান করবে।

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে যথার্থ মূল্যায়ন করে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কোন কাজের প্রতি ও বৈধ উপার্জনে উৎসাহ প্রদান করে যাতে মানুষের জিন্দেগী সুন্দর হয়, শান্তিময় হয়, প্রত্যেক মানুষ স্বসম্মানে জীবন যাপন করতে পারে, অন্যায় ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করতে না পারে। অন্যের সম্পদ সার্বিক সংরক্ষণের জন্যই আল্লাহ্ চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রকৃত পক্ষে চোর কষ্ট ছাড়াই ধন সম্পদের মালিক হতে চেষ্টা করে। বৈধ পন্থা বাদ দিয়ে অবৈধ পন্থায় অন্যের কষ্টে অর্জিত সম্পদ চুরি করে বলে ইসলামী বিধানে এই পাপিষ্ঠদের হাত কেটে ফেলার আইন প্রণীত হয়েছে, যাতে চোর এই গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকে এবং মানুষ তাদের সম্পদের ব্যাপারে নিরাপদ থাকতে পারে। মানব রচিত বিধানে জেলখানায় আবদ্ধ রাখার যে আইন রয়েছে তাতে পরিস্ফুটিত হয় যে, সে জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার পূর্বের ন্যায় চুরির কাজে লিপ্ত হয়। কথিত আছে যে, চোর জেল থেকে ডাকাত হয়ে বেরিয়ে আসে। কারণ সেখানে সে বড় বড় ডাকাতের সাক্ষাৎ পায় এবং তাদের থেকে ট্রেনিং পায়। এই আইনে ব্যক্তির প্রতি নজর দেয়া হয়, কিন্তু দেশ ও সমাজের স্বার্থের দিক চিন্তা না করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অথচ সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির উপস্থিতি রয়েছে।

ইসলামের শত্রুরা বলে থাকে, শরীয়তী আইনে দিনারের এক চতুর্থাংশ চুরি করার জন্য চোরের হাত কাটা হয়, অথচ হাত কতই না মুল্যবান সম্পদ! মুসলিমদের জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ এর উত্তর এভাবেই দিয়েছেন ঃ

* আমানতের গৌরব সব চেয়ে দামী, খিয়ানতের অপমান সবচেয়ে মূল্যহীন। আল্লাহর বিধানে এটাই পরিস্ফুটিত।

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ ﴿الحج١٨﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। (সূরা আল হাজ্জ, ২২ ঃ ১৮ আয়াত)।

لَمَّا كَانَتْ آمِنَةً كَنَتْ ثَمِيْنَةً وَلَمَّا خَانَتْ هَانَتْ

হাত যখন আমানত রক্ষাকারী ছিল তখন তা ছিল দামী, আর যখন তা খিয়ানত করেছে তখন তা অপমানিত হয়েছে।

* মানুষ যাতে অন্যের সম্পদ চুরি করতে দ্রুত ধাবিত না হয় সে জন্যই চুরির সর্ব নিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে দিনারের এক চতুর্থাংশ।

* চোরের স্বভাব নম্রতা ও ক্ষমা দিয়ে ঠিক করা যায় না, বরং প্রয়োজন হয় উপযুক্ত শাস্তির। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿المائدة٣٨﴾

অর্থ ঃ যে নর-নারী চুরি করে তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে তাদের হাত কেটে দাও। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী! আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। (সূরা মায়েদা, ৫ ঃ ৩৮ আয়াত)।

আল্লাহর আইন কারও জন্য খাস নয়, বরং সবার জন্য প্রযোজ্য। রাজা হোক, প্রজা হোক; ধনী হোক কিংবা গরীব হোক, এ ব্যাপারে কারও জন্য ভিন্ন কোন সুপারিশ নেই। কেউ জবাবদিহিতার উর্ধ্বে নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَوْ أَنَّ فَطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

অর্থ ঃ যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো তাহলে অবশ্যই আমি তার হাতও কেটে দিতাম।

কোন অঙ্গে ক্যান্সার হলে ডাক্তারগণ অপারেশনের মাধ্যমে তা কেটে ফেলে দেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, শরীর থেকে ক্যান্সারযুক্ত অঙ্গটি সম্পূর্ণ আলাদা করতে হয়। অন্যথায়, তা ভবিষ্যতে অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গে বিস্তার লাভ করে পরিশেষে জীবন নাশের কারণ হতে পারে। অথচ এই অপারেশনের কারণে কাউকে ডাক্তারগণের সমালোচনা করতে দেখা যায় না। মানুষের কি হলো? সর্বজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুমের সমালোচনা করছে! আসলেই হত্যাকারী, অপরাধী, চোর, ডাকাত, হাইজাকার ও সন্ত্রাসী সমাজের ক্যানসার। এদেরকে আল্লাহর আইনের মাধ্যমে যেখানে যে অপারেশন প্রয়োজন তা যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা আনয়ন করাই হবে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। আর যদি এই ক্যান্সারযুক্ত অঙ্গ অপারেশন না করে সমাজে রেখে দেয়া হয় তাহলে সেই সমাজ অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেই থাকবে। পরিশেষে সেই সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿فصلت٤٦﴾

অর্থ ঃ আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি কখনই যুলুম করেন না। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৬ আয়াত)।

প্লেগ রোগে আক্রান্ত এলাকা থেকে বের হওয়া নিষেধ কেন?

প্লেগ রোগে আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ করতে অথবা সেই এলাকা থেকে বের হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করলেন কেন? বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إذا سَمِعْتُمْ باالطَّاعُوْن بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوْهَا وَإِذَا كُنْتُمْ فِيْهَا فَلا تَخْرُجُوْا مِنْهَا (رواه البخاري)

অর্থঃ যদি কোন এলাকায় তোমরা প্লেগ রোগের খবর শোন তাহলে সেই এলাকায় তোমরা প্রবেশ করবে না এবং তোমরা যদি সেই এলাকায় থেকে থাক তাহলে সেখান থেকে বের হবে না। (বুখারী)।

কোন এলাকা বা শহর যদি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়, আর এ খবর যদি কেউ পায় তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উক্ত শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ সেও সেই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু প্লেগ রোগে আক্রান্ত যে শহরটিতে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে এমতাবস্থায় সেই শহরের সুস্থ ব্যক্তিরা কেন সেই শহর থেকে বের হবে না? কেন তারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিবে না? কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ থেকে মুক্ত হতে ও রক্ষা পেতে নিষেধ করলেন? তা হলে ইসলাম মানুষকে কখনও ক্ষতি ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে চায়? না, ইসলাম মানুষকে কখনও ক্ষতি ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় না, বরং ইসলাম মানুষের সার্বিক কল্যাণ চায়। ইসলামে রয়েছে সর্বস্তরে, সর্বাবস্থায় চিরন্তন সফলতা।

ডেনমার্কের জনৈক ডাক্তারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ আপনি যদি এমন শহরের শাসক হয়ে থাকেন যে শহর প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছে তখন আপনি কি করবেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি ঐ শহরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিব এবং সেই শহরের সীমান্তে পুলিশ নেয়োগের মাধ্যমে যারা ঐ শহরে প্রবেশ করতে চায় তাদেরকে নিশেধ করব এবং যারা উক্ত শহর থেকে বের হতে চায় তাদেরকেও নিষেধ করব। প্রশ্ন করা হলো ঃ কেন এমন করবেন? প্রবেশকারীকে প্রবেশ করতে না দেয়াটা সবার কাছে স্পষ্ট। কিন্তু যে বের হতে চায় তাকে কেন আপনি বাধা দিবেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ বর্তমান

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রকাশ, প্লেগ রোগের জীবানুর নাম ইয়ারসিনা পেষ্টি। যে এলাকায় এই প্লেগ রোগ দেখা দেয় সেই এলাকায় এতো ব্যাপক ভাবে অল্প সময়ে এই জীবানু বিস্তার লাভ করে যে, কোন কোন সময় এই রোগ শতকরা ৯৫% ভাগ মানুষের শরীরে পৌঁছে যায়। কিন্তু কিছু মানুষ রয়েছে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল। তাই তাদের শরীরে এই রোগ প্রাধান্য লাভ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়, তারা মৃত্যুর কোলে পতিত হয়। আর কিছু লোক রয়েছে যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে এই জীবানু যুদ্ধ করতে থাকে। তাদের শরীরে কিছুটা জ্বর অনুভূত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটি উক্ত জীবানুর উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।

আরও কিছু ব্যক্তি রয়েছে যাদের শরীরে রোগের কোন চিহ্ন বা আলামত প্রকাশ পায় না। এর অর্থ হচ্ছে, উক্ত মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ যন্ত্রটি শরীরের মধ্যে এমন জিনিস উৎপন্ন করতে থাকে যা উক্ত জীবানুগুলোকে ধ্বংস করতে থাকে। অতএব এই ধরনের ব্যক্তির প্লেগ আক্রান্ত এলাকায় অবস্থান করায় ভয়ের কোন কারণ নেই। জীবানু শরীরে প্রবেশের পরও যে সুস্থ রয়েছে আসলেই তার ভয়ের কিছুই নেই। কেননা তার শরীর জীবানুনাশক শক্তি উৎপন্ন করতে সক্ষম। ইনশাআল্লাহ সেখানেও সে সুস্থ থাকবেই।

কিন্তু এই সমস্ত সুস্থ ব্যক্তিদের মাঝে কাউকে যদি বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। হ্যাঁ, আমাদের খালি চোখে সে রোগী না, বরং সুস্থ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে এই জীবানু বহন করছে। তার শরীর এই জীবানুর উপর প্রধান্য বিস্তার করছে। যদি উক্ত ব্যক্তিকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয় তাহলে সে নতুন শহরে গমন করবে। অতঃপর এই জীবানু দুর্বল শরীরে স্থানান্তরিত হবে। তারপর বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্বল শরীর কে নিঃশেষ করবে। তারপর ব্যাপক ভাবে রোগ বিস্তার লাভ করবে। মাত্র একটি মানুষের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হবে।

উল্লেখ থাকে যে, ছয়/সাত বছর পূর্বে ভারতে প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল। তাই আন্তর্জাতিক ভাবে সকল ফ্লাইট বন্ধ করা হয়েছিল এ জন্য যে, সেখানে যাতে কোন লোক প্রবেশ করতে না পারে এবং সেখান থেকেও কোন লোক বাহিরে আসতে না পারে। শুধু তাই নয়, এমনকি জিনিস পত্র আদান প্রদান পর্যন্ত বন্ধ ছিল। ডাক্তারী পরিভাষায় এটাকে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা বলা হয়। অথচ ১৪০০ চৌদ্দ শত বছর পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন ঃ

إذا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوْهَا وَإِذَا كُنْتُمْ فِيْهَا فَلا تَخْرُجُوْا مِنْهَا (رواه البخاري)

যদি কোন এলাকায় তোমরা প্লেগ রোগের খবর শোন তাহলে সেই এলাকায় তোমরা প্রবেশ করবে না এবং তোমরা যদি সেই এলাকায় থেকে থাক তাহলে সেখান থেকে বের হবে না। (বুখারী)।

কে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই খবর দিলেন? অথচ তিনি লেখা পড়া জানতেন না। সে সময় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিস্কার হয়নি না, হয়েছিল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিস্কার। বস্তু সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও বিশেষ জ্ঞান ছাড়া কেউ এ বিষয়ে জানতে পারে না। মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে চিরন্তন শাশ্বত শান্তির বাণী নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য। তাই তার পদাংক অনুসরণেই রয়েছে সফলতা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন মাছিকে সম্পূর্ণ ডুবাতে বলেছেন? মাছির ডানায় কি রোগনাশক ঔষধ রয়েছে?

বুখারী ও ইবনে মাজাহ হাদীসে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إذا وَقَعَ الذُّبابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِى أَحَدِ جنَاحيْه دَاءً وَفى الْأخَرِ شفاء (رواه البخاري)

অর্থ ঃ যদি তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পতিত হয় সে যেন উক্ত মাছিটিকে ডুবিয়ে দেয়। কেননা তার একটি ডানায় রোগ জীবানু রয়েছে, আর অপরটিতে রয়েছে রোগনাশক ঔষধ। (বুখারী)

আমাদের মাঝে এমন কি কেউ আছে যে উক্ত রোগের জীবানুগুলো দেখেছে? আমাদের কেউ কি উক্ত রোগ নাশক ঔষধ অবলোকন করেছে? অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই তা রয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। সেখানে রোগ রয়েছে মানুষ তা জানতো না। তারা দেখতে পায়, মাছি তার দুই ডানা দিয়ে উড়ে যায়। কিন্তু এ বিষয়ে তারা কিছুই জানতো না যে, তার ভিতরে কল্যাণ রয়েছে, না অকল্যাণ রয়েছে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের যখন অগ্রগতি হলো, যখন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস জীবানু সম্পর্কে জ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে বর্ণিত হচ্ছে যে, মাছি মানুষের শত্রু, সে রোগ জীবানু বহন করে এবং স্থানান্তরিত করে। মাছির ডানায় রোগ জীবানু রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই যদি হয় তাহলে কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগ জীবানু বহনকারী মাছিকে ডুবিয়ে নেয়ার আদেশ করলেন?

কিং আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উস্তাদ ডক্টর ওয়াজিহ্ বায়েশরী এই হাদীসের আলোকে মাছিকে নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা চালান। জীবানুমুক্ত কিছু পাত্রের মাধ্যমে মাছের বাজার থেকে কয়েকটি মাছি ধরে নিয়ে জীবানুমুক্ত টেষ্ট টিউবের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। তারপর নলটি একটি পানির গ্লাসে উপুড় করেন। মাছিগুলো পানিতে পতিত হওয়ার পর উক্ত পানি থেকে কয়েক ফোটা পানি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেই পানিতে অসংখ জীবানু রয়েছে। তারপর জীবানুমুক্ত একটি সূঁচ দিয়ে মাছিকে ঐ পানিতেই ডুবিয়ে দেন। তারপর কয়েক ফোটা পানি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেই পানিতে আগের মত আর জীবানু নেই, বরং কম। তারপর আবার ডুবিয়ে দেন। তারপর কয়েক ফোটা পানি নিয়ে আবার পরীক্ষা করেন। এমনি ভাবে কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখেন যে, যত বার মাছিকে ডুবিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন ততই জীবানু কমেছে অর্থাৎ ডক্টর ওয়াজীহ্ এটা প্রমাণ করে দিখিয়েছেন যে, মাছির একটি ডানায় রোগ জীবানু রয়েছে এবং অপরটিতে রোগনাশক ঔষধ রয়েছে।

সৌদী আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টম চিকিৎসা সম্মেলনে কানাডা থেকে দু'টি গবেষণা-রিপোর্ট পাঠিয়েছিল যাতে বর্ণিত ছিল, মাছিতে এমন কোন বস্তু রয়েছে যা জীবানুকে ধ্বংস করে দেয়। শাইখ মোস্তফা এবং শাইখ খালীল মোল্লা এই বিষয়ে জার্মান ও ব্রিটেন থেকে রিসার্চগুলো ধারাবাহিক সংগ্রহের মাধ্যমে একটি বই বের করেছেন যার মূল বিষয় ছিল ঃ

فإن فى أحد جناحيه داءً وَفى الْآخر شفاء (رواه البخاري)

অর্থঃ নিশ্চয়ই মাছির একটি ডানায় রয়েছে রোগ, আর অপরটিতে রয়েছে রোগ নাশক ঔষধ। (বুখারী)

মাছি যখন কোন খাদ্যে বসে তখন যে ডানায় জীবানু থাকে সে ডানাটি খাদ্যে ডুবিয়ে দেয়। অথচ তার অপর ডানায় থাকে প্রতিরোধক ভাইরাস। যদি মাছিকে ডুবিয়ে দেয়া হয় তাহলে প্রতিরোধক ভাইরাস খাদ্যের সঙ্গে মিশে মারাত্মক জীবানুগুলিকে ধ্বংস করে দেয় এবং খাদ্য স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য অনুকুল থাকে। নতুবা এই খাদ্যই জীবানুযুক্ত হয়ে মানব ধ্বংসের কারণ হতে পারে। সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে এই ক্ষুদ্র জীবানু দেখার শক্তি মানুষের ছিল না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং সে সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং ঐ বিপদজনক দিক বর্ণনা করেছেন যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। কে তাঁকে জানিয়ে দিলেন?

গরম পাত্রে ফুঁক দেয়া নিষেধ কেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কেন পাত্রে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

إذا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فى الْاَنَاءِ (رواه البخاري)

অর্থ ঃ যখন তোমাদের কেউ পান করবে তখন সে যেন পাত্রটিতে ফুঁক না দেয়। (বুখারী)।

কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গরম খাদ্য খাওয়ার সময় অথবা পান করার সময় সেই খাদ্য অথবা পানীয় বস্তুতে ফুঁক দিতে নিষেধ করলেন? কি রয়েছে এই ফুৎকারে? এমনিই অযথা এবং অযৌক্তিক কি এই নিষেধাজ্ঞা? না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অথবা নিষেধ কখনই অবান্তর বা অযৌক্তিক নয়, বরং তাঁর প্রতিটি নির্দেশ ও নিষেধে রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ ও সফলতা।

অবশ্যই যে হাওয়া মানুষের শরীর থেকে বের হয় তাতে এমন পদার্থ রয়েছে যা মানব জাতির চরম ক্ষতি আনয়ন করে। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রকাশ যে, যক্ষ্মা রোগ যে সকল মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে সেই মাধ্যমগুলোর প্রধান পন্থা বা মাধ্যম হচ্ছে কোন পাত্রে ফুঁক দেয়া। বিশেষ করে গরমের কারণে মানুষ পাত্রে ফুঁক দেয়। যক্ষ্মার জীবানুগুলো যত বেশী গরম পায় তত বৃদ্ধি পায়। আর যত গরম কম হয় তাতে এই জীবানু মরে যায়। সুদানের অধিকাংশ অধিবাসী এই যক্ষা রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসাকগণ এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে এটা জানতে পেরেছেন যে, সুদান অধিবাসীরা অত্যাধিক গরম পানীয় পান করে সীমালংঘন করত এবং পান করার সময় তাতে ফুঁক দিয়ে পান করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বিপরীত কাজ করার কারণেই সুদানে যক্ষ্মা রোগের বিস্তার এতো বেশী।

বদ্ধ পানিতে প্রসাব করার কু-ফল কি?

لا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِى ثُمَّ لا يَغْتَسِلْ فيه (رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذى)

অর্থ ঃ অবশ্যই তোমাদের কেউ সেই বদ্ধ পানিতে (যা প্রবাহমান নয়) প্রসাব করবে না, যে পানিতে কিছুক্ষণ পর গোসল করবে। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী)।

চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রকাশ করছে যে, বেলহারজিয়া জীবানু বদ্ধ পানিতে জন্ম ও বিস্তার লাভ করে এবং তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ তখনই আক্রান্ত হয় যখন এই পানি দিয়ে অযূ বা গোসল করা হয়।

কুকুরের লালাযুক্ত পাত্র মাটি দিয়ে পরিস্কার করতে হবে কেন?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إذا وَلَغَ الكَلْبُ فى إنَاء أحَدِكُمْ فَلْيَغْتَسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إحْدِيهُنَّ بِالتُّراب (رواه ابن ماجة)

অর্থ ঃ যদি তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দেয় সে যেন উক্ত পাত্রটি সাতবার ধৌত করে, তার মধ্যে একবার মাটি দিয়ে। (ইবনে মাজাহ)।

প্রশ্ন হচ্ছে ঃ কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের লালাযুক্ত পাত্র পরিস্কার করার জন্য মাটির শর্ত সংযুক্ত করলেন? এই হাদীসকে সামনে রেখে লন্ডনের এক ব্যক্তি কিছু দিন পূর্বে পরীক্ষা চালিয়েছেন। তার কল্পনা ছিল, এই হাদীস থেকে কিছু ত্রুটি বের করবেন। বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ। এ যুগে অত্যাধুনিক কিছু কিছু জিনিস রয়েছে যা দিয়ে পরিস্কার করলে হয়ত মাটির প্রয়োজন হবে না। তিনি একটি পাত্রে কিছু খাদ্য রেখে তা কুকুরকে দিলেন। কুকুরটি তা খাওয়ার পর অনুবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তা পরীক্ষা করে দেখেন যে, উক্ত পাত্রটির মধ্যে অসংখ্য বিষাক্ত জীবানু রয়েছে। তারপর সাবানসহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে ভাল করে পরিস্কার করার পর আবার উক্ত যন্ত্র দিয়ে দেখেন যে, তাতে জীবানু রয়েই গেছে। এমনি ভাবে বহু বার পরিস্কার করার পরও উক্ত পাত্রটি জীবানু মুক্ত হয়নি। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাতলে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী মাটি দিয়ে পরিস্কার করার পর দেখেন যে, উক্ত পাত্রটি সম্পূর্ণ ভাবে জীবানু মুক্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়

প্রশস্ত হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ এই তত্ত্ব একজন লেখা পড়া না জানা ব্যক্তি থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে প্রকাশ পাওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি তার নিজের জ্ঞানলব্ধ বিবেক থেকে বর্ণনা করেননি, বরং মহান করুণাময় সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এই দ্বীন সত্য দ্বীন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি স্বপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

প্রকাশ থাকে যে, মাটির মাঝে এমন একটি পদার্থ রয়েছে যা কুকুরের লালার বিষাক্ত ক্ষুদ্র জীবানুকে সমূলে ধ্বংস করতে পারে। কুকুরের লালায় মানব জাতির জন্য ক্ষতিকারক জীবানু রয়েছে। এই মাটি সেই জীবানুও ধ্বংস করতে সক্ষম। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেনঃ

فَلْيَغْتَسِلْهُ سَبْعَ مَرَّات وَ إِحْدِيهُنَّ بِالتُّرابِ

অর্থ ঃ যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে অথবা খেয়েছে অথবা লালা লেগেছে সেই পাত্রটি যেন মাটি দিয়ে একবারসহ সর্বমোট সাতবার পরিস্কার করা হয়। কুকুর মানুষের মাঝে সব চেয়ে বেশী রোগ জীবানু ছড়ায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لا تُدْخِلُوْا الْكِلابَ الْبُيُوْتَ

অর্থ ঃ তোমরা কুকুরকে বাড়ীতে প্রবেশ করাবে না।

এমন ধরনের নিষেধ থকা সত্বেও অনেক লোককে আমরা দেখতে পাই, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেমে অন্ধ হয়ে নিজেদের দয়াশীল মনে করে এই বলে যে, এমন বুদ্ধিমান বন্ধুসুলভ ও বিশ্বস্ত জন্তু থেকে বিরত থাকতে বলা হলো কি করে? এ ধরনের লোকদের গোচরে আমরা এক জার্মান মনীষীর লিখিত ও জার্মান এক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনা পেশ করতে চাই এই রচনায় কুকুর পালন করা ও কুকুরের সংস্পর্শে আসার কারণে যে সমস্ত বিপদ অবশ্যম্ভাবী তা ব্যক্ত করা হয়েছে। রচনাটি এইঃ

বিগত কয়েক বছরে লোকদের কুকুর পালনের আগ্রহ খুব বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে এর পরিণামে কি বিপদ ঘটতে পারে সেদিকে আলোকপাত করছি। লোকেরা শুধু কুকুর পালন করেই ক্ষান্ত হয় না। তার সাথে খেলা করে, তাকে চুম্বন করে। উপরন্তু কুকুরকে এমন ভাবে মুক্ত করে দেয়া হয় যে, ছোট বড় সকলেরই হাত চাটে। অনেক সময় উদ্বৃত্ত খাবার নিজেদের পাত্রে বা থালায় করেই কুকুরের সামনে তুলে দেয়া হয়। এ অভ্যাস এতই খারাপ যে, সুস্থ বিবেক ও সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। তা পরিচ্ছন্নতার নিয়ম কানুনেরও পরিপন্থী। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে কুকুর পালন করা এবং তার সাথে খেলাধুলার কারণে যে বিপদ মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনের উপর ঘনীভূত হয়ে আসতে পারে তাকে সামান্য ও নগন্য মনে করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না। অনেক লোক নিজের অজ্ঞতার জন্য চরম মাশুল দিতে বাধ্য হয়। তার কারণ এই যে, কুকুরের দেহে এমন জীবানু রয়েছে যা এমন রোগ সৃষ্টি করতে পারে, যা স্থায়ী এবং যা চিকিৎসা করে নিরাময় করা যায় না। কত লোক যে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবন দিতে বাধ্য হয় তা গণনা করে শেষ করা যায় না। এক ধরনের জীবানুর আকৃতি ফিতার ন্যায়। তা মানব দেহে খোঁস পাঁচড়ার ন্যায় রোগ সৃষ্টি করে। এ ধরনের জীবানু গৃহপালিত পশু ও বিশেষ করে শুকরের দেহেও পাওয়া যায়। কিন্তু লালিত পালিত হয়ে বড় হওয়ার প্রবণতা কেবল কুকুরের দেহের জীবানুর মধ্যেই রয়েছে।[14]

এসব জীবানু মানুষের কলিজায় প্রবেশ করে। আর তথায় নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তা অনেক সময় ফুসফুস, ডিম্ব, গুর্দা ও মস্তকে প্রবেশ করে। তখন সেগুলোর আকৃতি অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, বিশেষজ্ঞগণও তা চিহ্নিত করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। সে যাই হোক, এ জীবানুর কারণে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তা দেহের যে কোন অংশেই হোক না কেন স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ও মারাত্মক। এ সব জীবানুর কোন চিকিৎসা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। জার্মান চিকিৎসাবিদ নুল্লর বলেছেন ঃ কুকুরের জীবানুর কারণে মানব দেহে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার সংখা শতকরা একের কম নয়। আর কোন কোন দেশে শতকরা বারো পর্যন্ত এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ রোগ প্রতিরোধ করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, এ জীবানুগুলোকে কুকুরের দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ করে রাখা, তাকে ছড়িয়ে পড়তে না দেয়া।

[14] ইসলামে হালাল হারামের বিধান।

বিধর্মী চিন্তাবিদদের গবেষণামূলক বর্ণনা সম্মুখে রেখে বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুকুরের সাথে ঘনিষ্ট মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন তা বাস্তব ও যুক্তি ভিত্তিক এবং একান্তই বিজ্ঞান সম্মত। এ বিধানে বিশ্ব মানবতার জন্য যে কি বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়।

বস্তুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজন উম্মী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর উপস্থাপিত শিক্ষা বর্তমানে এই চৌদ্দ শত বছর পরের অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে যে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা দেখলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। এ সত্য দেখার সাথে সাথে আমাদের কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কুরআন মাজীদের এ ঘোষণা ধ্বনিত হয়ে উঠেঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿سورة النجم٤﴾

অর্থ ঃ রাসূল নিজের ইচ্ছামত কিছুই বলেন না, যা বলেন তা অহী ভিন্ন আর কিছু নয়। (সূরা নজম, ৫৩ ঃ ৩ ও ৪ আয়াত)।

কিভাবে মধুতে রোগের প্রতিকার রয়েছে?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস এবং তাঁর কাজকর্ম থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি যেমন রোগের বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি সেগুলির চিকিৎসার বর্ণনা দিয়েছেন যা 'তিব্বে নববী' নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ববর্তী চিকিৎসকগণ এর উপরেই নির্ভর করে চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক পুস্তক রচনা করেছেন।

রোগ বা ব্যাধি দুই প্রকার। হৃদয়ের ব্যাধি ও শরীরের ব্যাধি। অতএব চিকিৎসাও দুই ভাবে হয়ে থাকে। হৃদয়ের চিকিৎসা ও শরীরের চিকিৎসা। হৃদয়ের ব্যাধির চিকিৎসা কুরআন তেলাওয়াত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত দোয়া সমূহের মাধ্যমে হয়ে থাকে, আর শরীরের ব্যাধির চিকিৎসা হল ওষধ, পথ্য যা খাদ্যদ্রব্য থেকে তৈরী করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ওষধের মধ্যে বিশেষ ভাবে উলেখযোগ্য কালজিরা, পিয়াজ, রসুন ও মধু।

মধু হচ্ছে সুস্বাদু গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য নির্যাস। মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক তেমনি শরীরের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। রোগ ব্যাধি নিরাময়ে ব্যবস্থাপত্র হিসাবে প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন ব্যাধিতে মধু ব্যবহার হয়ে আসছে। কুরআন ও হাদীসে প্রমাণীত যে, মধু একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষধ; এতে কোনই সন্দেহ নেই এবং বিভিন্ন চিকিৎসার ক্ষেত্রে মধুর বিশেষ বৈশিষ্ট রয়েছে। মধুর নিরাময় শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরনের। আল্লাহর হুকুম, রহমত ও কুদরতে মধু প্রত্যেক রোগের ওষধ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿النحل٦٩﴾

অর্থ ঃ আপনার পালনকর্তা মধু মক্ষিকাকে আদেশ দিলেন ঃ পর্বত গাত্রে, বৃক্ষে এবং ডালে গৃহ তৈরী কর। এরপর সর্ব প্রকার ফল থেকে আহার করা এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথ সমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রংয়ের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশন রয়েছে। (সূরা নাহল, ১৬ঃ ৬৮ ও ৬৯ আয়াত)।

এই পবিত্র আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মধু ও মধুমক্ষিকাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন এবং মধুতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিকার রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে

বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, অনেক রোগ নিরাময়ে মধু অতি আশ্চর্যজনক ফলকারক। অপর দিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহ মধু ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ العَسَلِ وَالْقُرْآن

অর্থ ঃ তোমরা কুরআন ও মধু দিয়ে ব্যাধি নিরাময়ের ব্যবস্থা করবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ আল খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত রয়েছে ঃ

إنَّ رجُلاً أتى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلّمَ فقَالَ إنَّ أخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلّمَ اسْــقِه عَــسَلاً فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فقَال : قَدْ سَقَيتُهُ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيئاً مَرَّتَينِ أوْ ثَلاثًا كلُّ ذلك يقُوْل له اسقه عَسَلا فقال له في الثالثة أو الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيكَ (رواه البخاري ومسلم)

অর্থ ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল ঃ আমার ভাইয়ের পেটের অসুখ হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে মধু পান করাও। সে চলে গেল। তারপর ফিরে এসে বলল ঃ আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, তাতে তার কোন উপকার হয়নি। এবারও তিনি বললেনঃ তুমি তাকে মধু পান করাও। এভাবে দুইবার অথবা তিনবার বলা হল। প্রত্যেকবারেই তিনি মধু পান করানোর কথা বললেন। অতঃপর তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারে তিনি তাকে বললেন ঃ

صدق الله وكذب بطن أخيكَ

অর্থ ঃ আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। আল্লাহ বলেন ঃ

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

তাতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিকার রয়েছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৯ আয়াত)। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

لكلِّ داءٍ دواءٌ فاذا أصابَ دَواء الداء برئ بإذن الله عزّ وجَلَّ

অর্থ ঃ প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে। যখন কেহ নির্দিষ্ট রোগের সঠিক ঔষধ পেয়ে যায় তখন আল্লাহর হুকুমে সে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, মধুর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী জীবানু নাশক ক্ষমতা। এই ক্ষমতার নাম "ইনহিবিন"। মধুর সাথে কোন তরল পদার্থ মিশ্রিত হলে তা তরলীভূত হয়ে পড়ে। গ্লুকোজ অক্সিডেজ নামক বিজারকের সাথে মধুর বিক্রিয়া ঘটলে গ্লুকোনা ল্যাকটোন হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় জীবানু ধ্বংস হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, রোগ সৃষ্টিকারী ব্যকটেরিয়া মধুতে ডুবিয়ে দিলে মারা যায়। মধু ইষ্টের (Yeast) বংশ বৃদ্ধি ঘটতে দেয় না। এ কারণে খাঁটি মধু বোতলজাত করে অনেকদিন রাখা যায়। মধু একটি উৎকৃষ্ট প্রিজার্ভেটিভ বা সংরক্ষক। চিকিৎসা শাস্ত্রের এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদীতে ঔষধী গুণ বেশী দিন ধরে রাখার জন্য ঔষধের সাথে এলকোহল বা রেক্টিফাইড স্পিরিট মিশানো হয়। ইউনানীতে তৎপরিবর্তে মিশানো হয় মধু। বার্মার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ শবদাহ করার পূর্বে মধুতে ডুবিয়ে রেখে সংরক্ষণ করতেন। মিসরে গিজেহ পিরামিডের গহ্বর মধু দ্বারা পূর্ণ করা ছিল। সারা পৃথিবীতে কাশির ঔষধ ও অন্যান্য মিষ্টি দ্রব্য তৈরী করতে প্রতিবছর কম পক্ষে ২০০ টন মধু ব্যবহৃত হয়। খুসখুসে কাশিতে মধুর সাথে লেবুর রস উপশমদায়ক। মাতাল রোগীদেরকে স্থিরাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে মধু কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

গ্লুকোজের ঘাটতিতে হৃদপেশীর শক্তি কমে যায়। মধুর ব্যবহারে এ ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। ধমনী সম্প্রসারণ, করোনারী শিরার রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে মধুর ভূমিকা অপরিসীম। নিয়মিত মধু পান করলে রক্ত কণিকার সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কাজেই এনিমিয়া আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে মধু উত্তম পানীয়। হাঁপানী রোগে মধুর স্থান সবার উপরে। প্যারিসের "ইনিষ্টিটিউট অফ বী কালচার" এর পরিচালক রিমে কুভেন বলেন ঃ রক্তক্ষরণ, রিকেট, ক্যান্সার এবং শারীরিক দুর্বলতায়

মধুর অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। চিনির পরিবর্তে শিশুদেরকে মধু খেতে দেয়া হয়। চিনি দন্তক্ষয় ঘটায়, কিন্তু মধু তা করে না। মধু ব্যবহারে নবজাতক স্বাস্থ্যবান ও সবল হয়ে ওঠে।
এক চামচ বাদাম তেলের সাথে দুই চামচ মধু মিশিয়ে কাটা বা পোড়ার ক্ষতে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। ইনফেকশন, সাধারণ ঘা, ত্বকের আলসার, পচা-গলা ঘা মধু ব্যবহারে দ্রুত আরোগ্য লাভ হয়। নারীদের গোপন অঙ্গের অসহনীয় চুলকানীতে মধুর ব্যবহার অতীব কার্যকরী।[15]
আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿النحل٦٩﴾

অর্থ ঃ এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৯ আয়াত)।
বিজ্ঞান আমাদেরকে আরও জানতে সাহায্য করে যে, ফুলের পুস্পমঞ্জরী থেকে মৌমাছিরা মধু আরোহন করে। মাত্র ১০০ গ্রাম মধু আরোহন করতে মৌমাছিকে প্রায় দশ লক্ষ ফুলে ভ্রমণ করতে হয়। ফুল থেকেই ফলের জন্ম হয়। মৌমাছিরা ফুলের পরাগায়নে সহায়তা করে। ফুলে ভ্রমন করলেও পক্ষান্তরে ফলায়নেই সহায়তা করে থাকে। একটি পূর্ণ বয়স্ক মৌমাছি তার দেহের ওজনের পরিমাণের এক চতুর্থাংশ থেকে দুই চতুর্থাংশ পর্যন্ত পুস্পরস সংগ্রহ করে পাকস্থলীতে ধারণ করে এবং ১২০ থেকে ১৪০ বার উদগীরণ ও গলধঃকরণ করে। ফলে পাকস্থলীতে জটিল প্রক্রিয়ায় মধু তৈরী হয়।
আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ﴿النحل٦٩﴾

বিজ্ঞানীরাও পরীক্ষা করে দেখেছেন, মধুর রং ও উৎপাদনে পার্থক্য থাকে। স্বাদ, সৌরভ এবং ঘ্রানও হয় ভিন্ন। মধুর রং পানির মত বা সোনালী ঘন লাল। কোন কোন ক্ষেত্রে মধুর রং হালকা ধরণের। মধুর মূল উপাদনগুলি হচ্ছে পানি, শর্করা বা চিনি, এসিড, খনিজ, আমিষ এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন। শর্করাগুলোর মধ্যে থাকে লেকটোলেজ, ডেকট্রোজ, মালটোজ, ডাইম্যাকারাইড এবং কিছু উচ্চ মানের চিনি। মধুতে যে সব এসিড পাওয়া যায় সেগুলোর নাম সাইট্রিক, ম্যালিক, বুটানিক, গ-ুটামিক, স্যাক্সিনিক, ফরমিক, এসিটিক, পাইরোগুটামিক এবং এমাইনো এসিড।
মধুতে মিশ্রিত খনিজ দ্রব্যগুলো হচ্ছে পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকা ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, সালফেট, ফসফেট, কপার, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি। থায়ামিন, রিভোফ্লোবিন, ভিটামিন কে এবং ফলিক এসিড নামক ভিটামিন মধুতে বিদ্যমান থাকে।
বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মধু খাদ্য হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। দুধের পরেই আদর্শ খাদ্য হিসাবে মধুর স্থান। মধু সহজেই পরিপাক হয়। শর্করা থাকায় তা সহজেই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মধুর ক্যালরী উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। প্রতি কেজী মধুতে ৩১৫৪ থেকে ৩৩৫০ ক্যালরী পরিমাণ শক্তি থাকে।
মধু শক্তি যোগানোর পাশাপাশী ভিটামিন, খনিজ ও এনজাইম সরবরাহ করে। মধু থেকে প্রসাধনীও তৈরী হয়। ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষায় মধুর ভূমিকা খাট করে দেখার অবকাশ নেই। যে সমস্ত ভিটামিন মানুষের শরীরে প্রয়োজন, মধুতে সেই সমস্ত ভিটামিন রয়েছে। যেমন ভিটামিন এ, বি, সি ইত্যাদি। মধু নিঃসন্দেহে উত্তম ও উপকারী পানীয়। মধু ও মধুমক্ষিকা আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। আল্লাহর আদেশে বিশেষ কৌশলে মধু উৎপাদনকারী মৌমাছিও তাই আল্লাহর এক প্রিয় সৃষ্টি। আমরা যদি মধুর মূল উপাদানগুলোর প্রতি লক্ষ্য করি যার জন্য আল্লাহ এটা খাস করেছেন এবং যার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মধুকে মানুষের শেফা হিসাবে নির্ধারিণ করেছেন তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, মধুতে রয়েছে সুগার যার মিষ্টত্ব তৈরীকৃত সুগারের চেয়ে অনেক গুন বেশী। মধুতে প্রায় পনের প্রকার সুগার রয়েছে। যেমন গ্লুকোজ, সাকরোজ, ফ্রুকটজ, মালটোজ ইত্যাদি। এগুলো প্রতিটিই দ্রুত রক্তের সাথে মিয়ে যায় এবং সহজেই পরিপাক হয়। অতএব এক কথায় আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মধুতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিকার রয়েছে।

[15] মাসিক আশরাফ, এপ্রিল ২০০০. পৃষ্ঠা ২৬,২৭।

অতিরিক্ত আহার করা নিষেধ কেন?

ইসলামে মানব জীবনের সকল দিকের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে যা মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। শরীরের জন্য খাদ্য প্রয়োজন। তাই আমরা সকলেই খাদ্য গ্রহণ করি। উত্তম সুস্বাদু খাদ্য পরিমাণ মত আহার করার ব্যাপারে ইসলামে কোন নিষেধ নেই। নিষেধ শুধু অতিরিক্ত আহার ও অপচয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿الأعراف ٣١﴾

অর্থ ঃ পানাহার কর, কিন্তু অপচয় কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ, ৭ ঃ ৩১ আয়াত)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا مَلأَ ادَمِيٌّ وعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ بِحَسَبِ ابن آدمَ لُقَيمَتٌ يقمْنَ صُلْبَه فانْ لَمْ يَفْعَلْ فَثُلُثٌ للطَّعامِ وَثُلُثٌ للشَّرابِ وَثُلُثٌ للتَنَفُّسِ (رواه ابن ماجه)

অর্থ ঃ মানুষ তার পেটের ন্যায় খারাপ অন্য কোন পাত্রপূর্ণ করেনি। অথচ আদম সন্তানের কোমর সোজা রাখার জন্য কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট। আর যদি তা না করতে পারে তাহলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য, আর বাকী এক তৃতীয়াংশ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে। (ইবনে মাজাহ)।

তিনি আরও বলেছেন ঃ কাফির সাত আঁতে আহার করে অর্থাৎ বেশী পরিমাণ খায়, আর মু'মিন এক আঁতে আহার করে অর্থাৎ কম খায়। (মিশকাত)।

আরও বর্ণিত আছে ঃ

نحن قَوْمٌ لا نأكُلُ حَتّى نَجُوْعَ وإذا أَكَلْنا لا نَشْبَعُ

অর্থঃ আমরা এমন এক জাতি; ক্ষুধা না লাগা পর্যন্ত খাই না, আর যখন খাই তখন পরিতৃপ্ত ভাবে নয় অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাই না।

কেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে নিষেধ করলেন এবং অতিরিক্ত আহারে ক্ষতিই বা কি? খাদ্য বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, ৮০% রোগ ব্যাধি খাবারের কারণেই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে সেই খাদ্য যেমন হজম করতে বড় ধরণের শক্তি অপচয় হয় অর্থাৎ অতিরিক্ত আহার হজম শক্তিকে ক্লান্ত করে ফেলে এবং ক্লান্ত হয়ে যায় সেগুলো বের করতেও। এমন কি পায়খানা ও প্রস্রাবের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়।[16]

ডাঃ এ এইচ এম আজহারুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন ঃ অধিক ভোজনের প্রাথমিক ফল হল ডায়াবেটিস। কেননা বেশী খাওয়ার কারণে লালগ্রন্থিকে বেশী কাজ করতে হয়। এ কারণে আভ্যন্তরিণ আদ্রতা রস (insulin) কমে যায় এবং রক্তে চিনির (suger) পরিমাণ বেড়ে যায়। অধিক ভোজন রক্তের চাপ বৃদ্ধির আর একটি অত্যাবশ্যকীয় কারণ। কেননা ডায়াবেটিস এবং ব্লাড প্রেসার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অধিক ভোজনের কারণে প্যারালাইসিস হয়ে থাকে। এতে রক্তবাহী শিরাগুলি সংকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ ভাবে যখন শিরাগুলি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখন সংশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায়। আর এ অবস্থাটি মস্তিস্কের কোন অংশে হঠাৎ প্রকাশ পেলে মানুষ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়।

শিরার সংকীর্ণতা হৃদরোগের অন্যতম কারণ। কেননা শিরার চুড়ান্ত সংকীর্ণতা হৃদপিন্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এমতাবস্থায় হৃদপিন্ডের বিবর্তন হওয়া অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। অধিক ভোজনের ফলেই অসময়ে বার্ধক্যে পতিত হয়ে থাকে। কেননা বেশী খেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যথাযথভাবে কাজ

[16] الاسلام أو الضياع للشيخ عبد المجيد الزنداني (ص ٦٧)

করতে পারে না। ফলে মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই দুর্বল বা শক্তিহীন হয়ে যায় এবং তাকে অতি অল্প বয়সেই বৃদ্ধ বলে মনে হয়।
অধিক ভোজনের কারণে শরীর মোটা বা স্থুল হয়ে থাকে। এই অবস্থায় বহুবিধ রোগ ব্যাধি হয়ে থাকে। Bone Marrow pain বা অস্থি মজ্জার ব্যাথা, joint pain ইত্যাদি হয়ে থাকে।[17]
সাধারণতঃ শহরবাসীদের মধ্যে যারা অধিক ভোজন করে অপচয় করে তাদের শেষ বয়সে এ ধরনের কঠিন ব্যাধি পরিলক্ষিত হয়। অপর দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা অল্প ও স্বাভাবিক আহারে তুষ্ট থাকে এবং এটা অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে তারা এ সমস্ত রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকে। কেননা তাতে কোলেষ্টরেলের আধিক্য থাকে না এবং ঐ সমস্ত অতিরিক্ত বস্তুও থাকে না যা শরীরকে ক্লান্ত করে থাকে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে, মানুষের জন্য কোমর সোজা রাখার জন্য কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট। আর একান্তই যদি বেশী খাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে তাহলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করে বাকী এক ভাগ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখতে হবে যা একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই নির্দেশ ছিল। প্রফেসর রিচার্ড বার্ড গবেষণার পর প্রকাশ করেছেন যে, বেশী খাদ্য খেলে নিম্ন লিখিত রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হয়ঃ
১। মস্তিস্কের ব্যাধি।
২। চক্ষুরোগ।
৩। জিহবা ও গলার।
৪। বক্ষ ও ফুসফুসের ব্যাধি।
৫। হৃদ রোগ।
৬। যকৃত ও পিত্তের রোগ।
৭। ডায়াবেটিস।
৮। উচ্চ রক্ত চাপ।
৯। মস্তিস্কের শিরা ফেটে যাওয়া।
১০। দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা
১১। অর্ধাঙ্গ রোগ।
১২। মনস্তাত্তিক রোগ।
১৩। দেহের নিম্নাংশ অবশ হয়ে যাওয়া।[18]
তাই বর্তমানে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বার বার এ কথার উপর জোর দিচ্ছে যে, কম আহার করুণ, বেশী দিন বাঁচুন।

ইসলাম সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের ধর্ম

সত্য সুন্দর ও কল্যাণের ধর্ম ইসলাম। কেননা ইসলামের পুরোটাই সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ। তার মধ্যে কোন অসত্য নেই। নেই কোন অসুন্দর। নেই তাতে কোন ক্ষতি। আর ইসলাম ছাড়া প্রত্যেকটাই হক বাতিলের দ্বারা, ভাল ক্ষতি দ্বারা, সুন্দর খারাপ দ্বারা সংমিশ্রিত।
ইসলাম সত্য সুন্দর ও কল্যাণের ধর্ম। কেননা মাবুদ যিনি আমাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করছেন তিনি হচ্ছেন প্রত্যেক ভাল কাজের কর্তা। তিনি হচ্ছেন সুন্দর, তাই তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের রব / প্রতিপালক, তাঁর থেকে সমস্ত কল্যাণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তিনি সত্য। সমস্ত ভাল কাজের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত তিনি। এমনকি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ

---
[17] মাসিক মদীনা, অক্টেবর ২০০০ইং।
[18] সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান- ডাঃ মোঃ তারেক মাহমুদ।

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤القلم﴾

অর্থ ঃ আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা কলাম, ৬৮ঃ ৪ আয়াত)।
তাঁর সম্পর্কে তাঁর সহধর্মিনী যিনি তাঁর ভিতর বাহির অবগত আছেন, তিনি বলেন ঃ

كَانَ خُلُقُهُ القُرآن (رواه أحمد ٢٣٤٦٠)

অর্থ ঃ তাঁর চরিত্র ছিল আল কুরআন। (আহমাদ, ২৩৪৬০)
তিনি ছিলেন সত্যবাদী বিশ্বস্ত নম্র, ভদ্র, সাহসী, ধৈর্যশীল। তিনি সত্যের ব্যাপারে ভৎর্সনাকারীর ভৎর্সনার পরওয়া করতেন না। তার চেহারা ছিল সুন্দর। আত্মাও ছিল পবিত্র, কথা ছিল মাধুর্যপূর্ণ।
পবিত্র কুরআন যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এটা এমন একটি কিতাব যা সত্য বলে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে। কল্যাণ কাজে আদেশ করে এবং অকল্যাণ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর এতে বর্ণিত হয়েছে প্রতিটি কাজ সুন্দর ভাবে।

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ (الاسراء ١٠٥)

অর্থ ঃ আমি সত্যসহ এ কুরআন নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নাযিল হয়েছে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৫ আয়াত)।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢فصلت﴾

অর্থ ঃ এতে মিথ্যার প্রভাব নেই। সামনের দিক থেকেও নেই এবং পিছনের দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪২ আয়াত)।

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿البقرة٢﴾

অর্থ ঃ এই সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকিনের জন্য পথ প্রদর্শনকারী। (সুরা বাকারা, ২ঃ ২আয়াত)।

إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (الاسراء ٩)

অর্থ ঃ এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সরল । (সূরা ইসরা, ১৭ঃ ৯ আয়াত)।

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا (الانعام ١١٥)

অর্থ ঃ আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। (সূরা আনআম, ৬ঃ ১১৫ আয়াত)।
আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী, তিনি মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ (الاسراء ٧٠)

অর্থ ঃ আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭০ আয়াত)।
তাই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরুপ সকল সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। কারণ শুধুমাত্র শক্তি অর্জন করলেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয় না। বরং অর্জিত শুভ শক্তিকে সত্য, সুন্দর কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে সঠিক ভাবে ব্যবহার করলেই কেবল প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা অর্থাৎ বিবেক দান করেছেন এবং সেই সাথে সত্য ও শান্তির পথে সঠিক ভাবে চলার জন্য যুগের চাহিদা অনুযায়ী নবী ও তার রাসূলদের মাধ্যমে তার ঐশী বাণী সমূহকে সরাসরি মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন। বুদ্ধি ও বিবেকের সহায়তায় ঐশী বাণী সমূহের মর্মার্থ অনুধাবন এবং সেই অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে পারলেই একজন মানব সন্তান প্রকৃত মানব হিসাবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়। আর এ সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে কেবল বিভ্রান্তি র নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এসে ইহকালিন ও পরকালীন চুড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত আল কুরআন হল চিরন্তনভাবে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান। ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন ব্যতীত আর কোন বিকল্প নেই।
পরিশেষে ঘোষণা করছি, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে স্বীয় সত্য সুন্দর ও কল্যাণের ধর্ম ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমরা কখনও এ পথে পেতাম না, যদি তিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন।